সোজন বাদিয়ার ঘাট

—জসীম্ উদ্‌দীন



গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

তিন টাকা

গ্রন্থকার লিখিত অন্যান্য বই

নক্সী কাঁথার মাঠ (৬ষ্ঠ সং)	১॥০
রঙিলা নায়ের মাঝি (৩য় সং)	১৲০
হাসু (২য় সং) ১॥০, রাখালী (৪র্থ সং)	১৷৷০
এক পয়সার বাঁশী	২৲
বালুচর (২য় সং)	১॥০
The Field of the Embroidered Quilt	
(নক্সী কাঁথার মাঠের ইংরেজী অনুবাদ) ৪৲	১৷৷০
ধানখেত (২য় সং)	২৲

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ ১৩৪০, ২৮শে ফাল্গুন—১১০০
১৩৪৫ সন হইতে ১৩৪৮ সন পর্য্যন্ত বই ছাপা ছিল না।
দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩৪৮ আশ্বিন—১১০০
১৩৫২ সনের শ্রাবণ মাস হইতে
চৈত্র মাস পর্য্যন্ত বই ছাপা ছিল না।
তৃতীয় সংস্করণ ১৩৫২ চৈত্র—১১০০
১৩৫৪ হইতে ১৩৫৫ সনের কার্ত্তিক মাস
পর্য্যন্ত বই ছাপা ছিল না।
চতুর্থ সংস্করণ ১৩৫৫ কার্ত্তিক—১১০০

এই পুস্তক প্রকাশে অধ্যাপক বিশ্বপতি চৌধুরী মহাশয় আমাকে নানাভাবে সাহায্য করিয়াছেন। হাসিমুখে পরের কাজ করিয়া দেওয়ায় লোক তাঁহার মত একজনও নাই। তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া আমার প্রতি তাঁহার স্নেহকে আর ম্লান করিতে চাহি না। সোদর প্রতিম শ্রীমান শোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায় এই পুস্তকের শব্দসূচিটি প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। শ্রীমান আসাদ্ উদ্দৌলা শিরাজী, মৌলবী এম আসমত আলী ও আব্দুর রশীদ খাঁ সাহেব এই পুস্তক প্রকাশে আমাকে সাহায্য করিয়াছেন।

শ্রীকল্যাণকর গুপ্ত কবিতা লিখিবার জন্য আমাকে একখানা খাতা উপহার দিয়াছিলেন। সে খাতায় এই পুস্তকের প্রথম পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করি। তাহার স্মৃতির সহিত, ছাত্রজীবনের সেই ওয়াই, এম, সি,এ হোষ্টেলের আর আর বন্ধুদের স্মৃতিও এই পুস্তকে জড়িত থাক।

এই পুস্তকের চরিত্রগুলি সবই গ্রাম্য। তাহাদের মুখ দিয়া আমি যেসব কথার অবতারণা করাইয়াছি তাহাতে মাঝে মাঝে গ্রাম্য কবিদের রচনা হইতে পদবিশেষ জুড়িয়া দিয়াছি। তাহা ছাড়া এই পুস্তকের স্থানে স্থানে আমি পল্লীর গাথা-সাহিত্যের রচনারীতি অবলম্বন করিয়াছি। দৃষ্টান্ত স্বরূপ 'সাক্ষী থাকিও চন্দ্র সূর্য্য' প্রভৃতি লাইনের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহাতে পল্লীগ্রামের পারিপার্শ্বিক রচনায় বিশেষ সুবিধা হইয়াছে।

কিন্তু দুঃখের বিষয় আমার এই রচনারীতিকে কেহ কেহ ভুল চক্ষে দেখিয়াছেন। তাহাদের অনেকের ধারণা, আমি গ্রামের নিরক্ষর পল্লী-কবিদের রচনা চুরি করিয়া নিজের বলিয়া চালাইয়া দিতেছি। আমার এই চুরি হাতে কলমে ধরাইয়া দিবার জন্য কোন পত্রিকার সম্পাদক একজন লেখককে কিছু টাকা পর্য্যন্ত অঙ্গীকার করিয়াছিলেন।

রবীন্দ্রনাথও তাঁহার মেঘদূত নামক কবিতায় কালিদাস হইতে অনেকগুলি কবিত্বপূর্ণ লাইন জুড়িয়া দিয়া এই কবিতায় কালিদাসের যুগের একটা অপূর্ব্ব পারিপার্শ্বিক রচনা করিয়াছেন।

এখানে অবান্তর হইলেও আর একটা কথা বলিয়া রাখিব। আমি অনেকগুলি গ্রাম্য-গান কলিকাতার বহু গ্রামোফোন কোম্পানীতে রেকর্ড করাইয়াছি। এই গানগুলির মধ্যে কতকগুলি আমার নিজস্ব রচনা, কতকগুলিতে অশিক্ষিত গ্রাম্যকবিদের অসমাপ্ত রচনাকে আমি কতকটা সংস্কার করিয়া লইয়াছি, আবার কতকগুলি গ্রাম্য-গান সংগ্রহ করিয়া সেগুলি যেভাবে পাইয়াছি হুবহু সেই ভাবেই রেকর্ড করাইয়াছি। আমি বহুদূরে ঢাকায় থাকি বলিয়া এ বিষয়ে গ্রামোফোন

কোম্পানীর লোকরা অনেক সময় ভুল করিয়া বসেন। যে গান আমার সংগ্রহ করা সেই গানের উপরে রচক হিসাবে আমার নাম ছাপা হয়। এজন্য আমি বড়ই লজ্জিত। কিন্তু কোন রেকর্ড একবার বাহির হইয়া গেলে তাহার সংশোধন করা সহজ নয়। আমার রচিত 'রঙিলা নায়ের মাঝি' নামক গানের পুস্তকে আমি এ বিষয়ে ভুল সংশোধন করিতে চেষ্টা পাইয়াছি। এই পুস্তকের গ্রন্থকারের নিবেদনেও আমি এ বিষয়ে কিছু আলোচনা করিয়াছি।

আমাদের ফরিদপুর অঞ্চলে বহু চাষী মুসলমান ও নমশূদ্রের বাস। তাহাদের মাঝে সামান্য সামান্য ঘটনা লইয়া প্রায়ই বিবাদের সূত্রপাত হয়। এই সব বিবাদে ধনী হিন্দু-মুসলমানেরা উৎসাহ দিয়া তাহাদিগকে সর্ব্বনাশের পথে আগাইয়া দেয়। মহাজন ও জমীদারের মধ্যে কোন জাতিভেদ নাই। শোষণকারীরা পৃথিবীতে সকলেই এক জাতের। ইহাদের প্ররোচনায় হতভাগা নমশূদ্র ও মুসলমানদের যে অবস্থা হয় তাহা চক্ষে দেখিলে অশ্রুসম্বরণ করা যায় না। এমনই একটা ঘটনা লইয়া এই পুস্তকের সূত্রপাত।

এই পুস্তক লিখিতে বহুদিন লাগিয়াছে। ইহার অধিকাংশ অধ্যায়ই রাত্রের ঘটনা বলিয়া রাত্রেই লিখিতে হইয়াছে। আমার ছোট ভাই কবি শ্রীমান সোয়েদ উদ্‌দীনকে এজন্য বহু বিরক্ত করিয়াছি। কোন কোন দিন রাত্র তিনটায় এই পুস্তকের অধ্যায় বিশেষ শেষ করিয়া তাহাকে ঘুম হইতে জাগাইয়া সমস্তটা পড়িয়া শুনাইয়াছি। সে উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছে। কোন পুস্তক লিখিবার সময় এই ভাবের সমঝদার পাইলে যে কত ভাল লাগে তাহা বলিয়া বুঝাইবার নয়।

পরম শ্রদ্ধাস্পদ দীনেশচন্দ্র সেন ও অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই পুস্তকের পাণ্ডুলিপি পড়িয়া আমাকে নানাভাবে উৎসাহিত করিয়াছেন। তাঁহাদের দুইজনের কাছেই আমি বহুভাবে ঋণী। আজ সে কথা বলিবার সময় আসে নাই। নিজের জীবনকে যদি কোনদিন সুন্দর করিয়া গড়িতে পারি তবে সে কথা বলিব। সকলের যে এই পুস্তক পড়িয়া ভাল লাগিবে এতবড় দুঃসাহস আমার নাই। নানা দোষ ত্রুটির সহিত অতি সঙ্কোচে এই পুস্তক সাধারণের সম্মুখে বাহির করিলাম।

গ্রাম—গোবিন্দপুর
ফরিদপুর
২৮শে ফাল্গুন, ১৩৪০

জ, উ

এক

ওগো সাথী! মম সাথী! আমি সেই পথে যাব সাথে
যে পথে আসিবে তরুণ প্রভাত অরুণ তিলক মাথে।
যে পথে কাননে আসে ফুলদল
যে পথে কমলে পশে পরিমল,
যে পথে মলয় আনে সৌরভ শিশিরসিক্ত প্রাতে,
যে পথে বধূরা যমুনার কূলে
যায় ফুল হাতে প্রেমের দেউলে,
যে পথে বন্ধু বন্ধুর দেশে চলে বন্ধুর সাথে।

—অতুলপ্রসাদ

সোজন বাদিয়ার ঘাট

১

"যাদু এ তো বড় রঙ্গ, যাদু এ তো বড় রঙ্গ।
চার কালো দেখাতে পারো, যাবো তোমার সঙ্গ॥"
"কাক কালো, কোকিল কালো, কালো ফিঙের বেশ।
তাহার অধিক কালো, কন্তে, তোমার মাথার কেশ॥"
—ছেলে ভুলান ছড়া

ইতল বেতল ফুলের বনে ফুল ঝুর ঝুর করেরে ভাই,
ফুল ঝুর ঝুর করে ;
দেখে এলাম কালো-মেয়ে গদাই নমুর ঘরে।
ধানের আগায় ধানের ছড়া, তাহার পরে টিয়া ;
নমুর মেয়ে গা মাজে রোজ তারির পাখা দিয়া।
দূর্ব্বাবনে রাখলে তারে দূর্ব্বাতে যায় মিশে,
মেঘের খাটে শুইয়ে দিলে খুঁজে না পাই দিশে।
লাউয়ের ডগায় লাউয়ের পাতা, রৌদ্রেতে যায় উনে ;
গা-ভরা তার সোহাগ দোলে তারির লতা বুনে।
যে পথ দিয়ে যায় চলে সে, যে পথ দিয়ে আসে,
সে পথ দিয়ে মেঘ চলে যায়, বিজলি বরণ হাসে।

বনের মাঝে বনের লতা পাতায় পাতায় ফুল,
সেও জানে না নমু মেয়ের শ্যামল শোভার তুল।
যে মেঘেরে জড়িয়ে ধরে হাসে রামের ধনু,
রঙিন সাড়ি হাসে যে তার জড়িয়ে সেই তনু।

গায়ে তাহার গয়না নাহি, হাতে কাঁচের চুড়ি ;
দুই পায়েতে কাঁসার খাড় বাজছে ঘুরি ঘুরি।
এতেই তারে মানিয়েছে যা তুলনা নেই তার ;
যে দেখে সে অমনি বলে, দেখে লই আরবার।
সোনা রূপোর গয়না তাহার পরিয়ে দিলে গায়
বাড়ত না রূপ, অপমানই করতে হ'ত তায়।
ছিপ্‌ছিপে তার পাতলা গঠন, হাত চোখ মুখ কান
দুলছে হেলছে মেলছে গায়ে গয়না শতখান।

হ্যাচড়া পূজোর ছড়ার মত ফুর ফুরিয়ে ঘোরে
হেথায় হোথায় যথায় তথায় মনের খুশীর ভরে।
বেথুল তু'লে ফুল কুড়িয়ে ভেঙ্গে ফলের ডাল,
সারাটি গাঁও টহল দিয়ে কাটে তাহার কাল।
পুতুল আছে অনেক গুলো, বিয়ের গাহি গান,
নিমন্ত্রণে লোক ডাকি সে হয় যে লবেজান।
এসব কাজে সোজন তাহার সবার চেয়ে সেরা
ছমির সেখের ভাজন বেটা, বাব্‌রী মাথায় ঘেরা।
কোন্ বনেতে কটার বাসায় বাড়ছে ছোট ছানা,
ডাহুক কোথায় ডিম পাড়ে তার নখের আগায় জানা॥

সবার সেরা আমের আঁটির গড়তে জানে বাঁশী,
উঁচু ডালের পাকা কুলটি পাড়তে পারে হাসি।
বাঁশের পাতায় নথ গড়ায়ে, গাবের গাঁথি হার,
অনেক কালেই জয় করেছে শিশু মনটি তার।

তাগ্ধুমাধুম্ বাদ্যিবাজে কাল শেয়ালের বিয়ে ;
শিয়াল চলে শ্বশুর-বাড়ী খার্লুই মাথায় দিয়ে।
পদ্মাবতীর বরের বাড়ী সাত সাগরের পার ;
নীল হলুদে সাঁতার খেলে ধরি তাহার পাড়।
'উলু উলু মাদারের ফুল' তুলতে গেলাম বনে ;
দেখে এলাম গাছের ডালে চম্পাবরণ কনে,

চম্পাবরণ কনে নালো কঙ্কাবতীর সই,
খবর তাহার কেউ জানে না তারা দু'জন বই।
নানান সুরের ছড়ার নূপুর জড়িয়ে দু'টি পায়,
গেরাম ভরি নাচে তারা গাঙশালিকের প্রায়।

২

নানান বরণ গাভীরে একই বরণ দুধ
জগৎ ভরমিয়া দেখলাম একই মায়ের পুত।

—গাজীর গান

শিমুলতলি গাঁয়ে ;
গাছের পাতা বাতাস করে মাটির শীতল ছায়ে
নমু মুসলমানের আবাস, গলায় গলা ধরি
খোড়ো ঘরের চালগুলি সব হাসছে মরি মরি।
নমু পাড়ায় পূজা পরব, শঙ্খ কাঁসর বাজে ;
বউ-ঝিরা সব জয় জোকারে উৎসবেতে সাজে।
মুসলমানের পাড়ায় বসে ঈদের মহোৎসব,
মেজ্‌বানী দেয় ছেলে বুড়োয় করিয়ে কলরব।
মোরগ ডাকে মুরগী ডাকে পেঁয়াজ রসুন বাটি
তরকারিতে দেয় যে ফোড়ং, বাতাস হলে ভাটি।
নমু পাড়ার গন্ধ তাহার যায় যে মাঝে মাঝে ;
এতে তাদের হয় না ব্যাঘাত কোন রকম কাজে।

চড়ক পূজায় গাজন গাহি নাচে নমুর দল।
চৈতী ঢাকের বাদ্য বাজে, গাঁও করে টল্‌ মল্‌।
কীর্ত্তনেতে তুলিয়ে বাহু জাগায় কলরোল
মসজিদে তার বাজনা গেলে হয় না কোন গোল।
বরং সেথা মাঝে মাঝে ইহাও দেখা যায়
হিঁদুর পূজায় মুসলমানে বয়েৎ গাহেন গায়।

সরস্বতী পূজার লাড়ু গড়িয়ে দু-চার জোড়া।
মুসলমানের ঠোঁট ছুঁয়েছে তাও দেখেছি মোরা।
ছোঁয়া ছুঁয়ির এতই যে বাড়, পীরের পড়া জল
নমুর পোলার পীড়ার দিনে হয় নি তা বিফল।
দরগা তলায় করতে প্রণাম ভালের সিন্দুর দিয়ে
নমুর মেয়ে লাল করে যায় শুকনো মাটির হিয়ে।

নমু বাড়ীর তমাল তরু মেলি চিকন ডাল
মুসলমানের উঠান বেড়ে' দুলছে চিরকাল।
মোল্লাবাড়ীর জাঙলা হ'তে ঢাকাই সীমের লতা
ভাজন নমুর ঘরটি ধরে কইছে মনের কথা।
কিবা নমু কি মুসলমান কারো তরফ হ'তে
ইহার কোন প্রতিবাদই হয় নি কোন মতে।
গরীব তারা, ছোট-খাটো সুখ দুঃখ লয়ে
শিমুলতলি গাঁয়ের মাঝে আছে যে এক হয়ে।
মুসলমানের মরলে ছেলে যে দুখ সহে মায়,
নমু মেয়ের তুলসীতলায় প্রদীপ দোলে তায়।
স্বামীরে তার চিতায় দিয়ে বিধুর নমু-নারী,
শ্মশান ঘাটায় শঙ্খ সিঁদুর যায় যখনে ছাড়ি,
তখন তাহার আপন জনের যেমনি ব্যথা হয়,
মুসলমানী সখীর ব্যথা কম তাহ'তে নয়।
কবরে যে ঘুমায় ব্যথা চিতায় যে দুখ জ্বলে,
এক হয়ে তা নমু মুসলমানের বুকে দোলে।

এ সব তারা শিখল কোথা ? কোরান পুরাণ পড়ে
পায় নি ইহার হদিস তারা বলছি শপথ ক'রে।
মাথায় তাদের একই আকাশ দোলায় নীলের মায়া,
একই বাতাস দোলায় তাদের বনের কাজল ছায়া।
মাঠ তাহাদের সমান ঢালু, বৃষ্টি পড়া জল
এদিক থেকে গড়িয়ে ওদিক করে যে টলমল।
মুসলমানের বেড়ার ফাঁকে যে চাঁদ পশে ঘরে
নমুর উঠান বেড়ি সে চাঁদ নিতুই খেলা করে।
তেমনি এরা একের ব্যথা লয় যে সবার ভাগে
একের ঘরের সুখের দোলা আরের ঘরে লাগে।

নমুর মধ্যে নমুর সেরা গদাই মোড়ল নাম,
দেখতে যেমন নামেও তেমন—তেমন তাহার কাম।
বড় ঘরের চালের আগা আকাশ ছুঁতে চায়,
সুপুরি গাছ বাড়িয়ে বাহু বারণ করে তায়।
আথালে তার দশটি বলদ, চারখানা বায় হাল
দশটি রাখাল সামাল সামাল রাখতে তাদের তাল।

গরব তাহার মস্ত বড় আছে ধানের গোলা,
আর আছে তার জোয়ান জোয়ান সাতটি ভাজন পোলা
আরেক গরব গিন্নী আছেন, হয়ত বা ভুল করে
লক্ষ্মী দেবী নিজেই বাঁধা পড়েছে তার ঘরে।
পাড়ায় পাড়ায় কোঁদল করে ; যে ধারে তেল নুন,
ফেরেন তিনি মল বাজায়ে গেয়ে তাহার গুণ।

পান হ'তে তার চূণ খসাবে এমন বাপের ছেলে
শপথ করে বল্‌তে পারি দশ গাঁয়ে না মেলে।
সাত ঘাটে জল এক ক'রে সে ভরতে পারে ঘড়া ;
পাতাল পুরীর সংখ্যা বালির নখেতে তার পড়া।

আরো গরব আছে যে তার হাতের লাঠি খানি,
থাকতে হাতে ভয় করে না কোনই জন-প্রাণী !
ইহার চেয়েও গরব তাহার লক্ষ্মী মেয়ে ঘরে,
ছুলালী নাম, ছুলী বলেই ডাকে আদর করে।
সারাটা দিন খেলেই বেড়ায়, এঁদো পুকুর কোণে
বনবাদাড়ে ফুল কুড়ায়ে ফেরে সখীর সনে।
পায়ে তাহার কাঁসার খাড়ু ঝামুর ঝুমুর বাজে ;
সারা ক্ষণই ব্যস্ত আছে নানান রকম কাজে।
পুতুল গুলির অন্নপ্রাশন, কুকুর ছানার বিয়ে,
দিন যে তাহার যায় এমনই কত না কাজ নিয়ে।
বলেছি ত সকল কাজেই সোজন তাহার জুড়ি ;
হাজার খেলার ফন্দী আঁটে সারাটি গাঁও ঘুরি।

আয়রে ছেলের পাল মাছ ধরতে যাই,
মাছের কাঁটা পায়ে ফুটলো, দোলায় চেপে যাই ;
দোলায় আছে ছ'পণ কড়ি গণতে গণতে যাই।
এ নদীর জলটুকু টলমল করে,
এ নদীর ধারে রে ভাই বালি ঝুর্‌ঝুর্ করে ;
চাঁদ মুখেতে রোদ লেগেছে রক্ত ফেটে পড়ে।

—ছেলে ভুলান ছড়া

নমুদের মেয়ে আর সোজনের ভারি ভাব তুইজনে ;
লতার সঙ্গে গাছের মিলন, গাছের লতার সনে।
সোজন যেন বা তটিনীর কূল, তুলালী নদীর পানি।
জোয়ারে ফুলিয়া ঢেউ আছাড়িয়া করে কূল টানাটানি।
নামেও সোজন কামেও তেমনি, শান্ত স্বভাব তার,
কূল ভেঙে নদী যতই বহুক, সে তারি গলার হার।
তুলালী সে যেন বনের হরিণী, সোজন তাহার বন,
লতা পাতা ফুল ছায়া বিছাইয়া হরণ করিছে মন।
বনের হরিণী থাকে বনে বনে জানে সে বনের ভাষা,
সে বন ঘিরিয়া মন খানি তার বাহিরে যায় নি আশা।

সোজনের সাথে তার ভারি ভাব, পথে যদি দেখা হয়,
যেন রাঙা ঘুড়ি আকাশে উড়াল, হেন তার মনে লয়।
পিছন হইতে সোজন আসিয়া যদি বা হঠাৎ ডাকে,
কুড়ায়ে পাইল পাকা আমটিরে তুলীর এমনি লাগে।
সোজন আসিল জাম গাছটির আগ্‌ডালে যেন উঠি,
মেঘের মতন কালো জামগুলি তুলিতেছে মুঠি মুঠি।

যেন কে তাহারে ধরিয়া রেখেছে এত উঁচু করে তুলে,
কাঁদির খেজুর দু'হাতে ধরি সে পাড়িছে মনের ভুলে।
সোজনের সাথে তার ভারি ভাব, গোলাপ ফুলের গায়,
ছোট বুলবুলি বাসা বেঁধে যেন পাখার বাতাস খায়।
টুনটুনি পাখি উড়ে এসে যেন তাহার খোঁপায় নাচে,
লাল পোকা যেন ঘুরিয়া ফিরিছে তাহার চুড়ির কাচে।
সোজনের সাথে তার ভারি ভাব, দুলীর ইচ্ছে করে,
সোজনেরে সে যে লুকাইয়া রাখে সিঁদুর-কৌটো ভরে।
আঁচল খানিরে টানিয়া টানিয়া বড় যদি করা যেত,
সোজনেরে সে যে লুকায়ে রাখিত কেউ নাহি খুঁজে পেত।

সোজন না এলে দুলীর সেদিন চারিদিক আন্ধার ;
পুতুল তাহার ভেঙে যায় যেন চরণের ঘায়ে কার।
সেই ত সেবার অসুখ করিল, দুলী উঠে খুব ভোরে,
সাতটা মহিষ মানিয়া আসিল রক্ষাকালীর দোরে।
একুশ বামুন খাওয়াইবে দুলী সোজন সারিলে পর,
দু'শো মোমবাতি মানিয়া আসিল জেন্দা পীরের ঘর।
সোজন যেদিন সারিয়া উঠিল, কি খুশী দুলীর মনে,
খেজুরের আঁটি যত ছিল জমা বিলাইল জনে জনে।
ও পাড়ার সেই পুঁটী, যারে দুলী চক্ষে দেখিতে নারে,
ঠ্যাং-ভাঙা তার ছোট পুতুলটি দিয়েই ফেলিল তারে।
সেদিন তাহার মনে এত খুশী, সে খুশীর সরোবরে,
কালী-মাতা তার সাতটা মহিস হারাইল অকাতরে।
একুশ বামুন ভোজন ছাড়িল, জেন্দা মা বলে' পীর,
আদায় করিতে পারিল না দাম দু'শ'টি মোমবাতির।

সোজনেরে ছেড়ে চলে নাক তার—কক্ষণো নাহি চলে,
কোন কাজ তার হইতে পারে না সে নাহি নিকটে হ'লে

সেই একবার সোজন কেবল গিয়াছিল মামা-বাড়ী
চারিটি দিনের কড়ার করিয়া, মনে আছে সব তারি।
মামার দেশেতে তল্লা বাঁশের খুব ভাল বাঁশী হয়,
দুলীর জন্যে এগারটি বাঁশী আনিবে সে নিশ্চয়।
নানান রঙের সজারুর কাঁটা কত পড়ে আছে বনে,
এক বোঝা তার সে যদি না আনে, দেখে নিও তক্ষণে।
মামার দেশেতে পদ্ম-পুকুরে রঙিন ঝিনুক ভাসে ;
সাদা-দাঁড়-কাক ঘুরিতেছে বনে কাউয়ার ঠুটীর আশে।
ঘন বেত-ঝাড়ে বেথুল ঝুলিছে, কেউ পায়নিক খোঁজ,
কাঁদিতে কাঁদিতে খেজুর পাকিয়া ঝরিয়া পড়িছে রোজ।
এর সব কিছু নিয়ে সে আসিবে, তারপর ও-ই বনে,
সারাদিন ভরি অনেক গল্প করিবে যে দুই জনে।
ও পাড়ার মাঠে সেদিন যে তারা দেখে এলো চক্ষেতে,
কটার বাসায় ছাও হইয়াছে কুসুম-ফুলের খেতে।
দুলী যেন রোজ যাইয়া তাদের আদর করিয়া আসে,
কলমী ফুলের নোলক পরায়ে দেখে যেন আর হাসে।
বনের যেখানে শিমুলের ডালে বাঁধিয়াছে তারা হাঁড়ী,
কোন্ পাখি সেথা বাসা বাঁধে দুলী খোঁজ রাখে যেন তারি।
বেগুনের ডালে টুনটুনি পাখি ডিম যদি পেড়ে যায়,
কারেও কবি নে, সাবধান, যেন কেহ নাহি টের পায়।
এতটুকু দু'টি ছোট ছাও হবে, দেখিস একটা ধরে—
খোঁপায় যে তোর বেঁধে দিয়ে তোরে উড়াইব মজা করে।

আর শোন্ দুলী, তোদের বাড়ীর বিড়ালের ছাওগুলি
এরই মাঝে যদি চোখ মেলে চায় মোরে যা'স নাক ভুলি ;
একটি আমারে দিতেই হইবে, কেহ যেন নাহি লয়,
মোরে ছুঁয়ে তুই কীরা কাট দেখি—বাস হ'ল প্রত্যয়।

সকল শপথ রেখেছে সোজন আমরা বলিতে পারি,
এত লোক গাঁয়ে, সাধে কি সোজন মনের মতন তারি ?
সোজনের মত ছেলেই হয় না, তোমরা কি জান তার ;
রাঙা ঘুড়িখানি তার চেয়ে ভাল পারে কেহ উড়াবার।
সোজন বলেছে, দরকার হ'লে ঘুড়ির সূত্র ধরে,
ও-ই আকাশেতে উড়িয়া যাইতে পারে সে হাওয়ার ভরে'।
সেখানে নিতুই কত তারা ফুল ফুটিয়া ফুটিয়া হাসে,
সেথায় গাঁথিয়া তারার মালা, সে বসিবে চাঁদের পাশে।
শেষ রাতে দুলী উঠানে আসিয়া তারে যেন ডাক ছায় ;
পোড়া চোখে তার এত ঘুম ; তাই ডাকিতে পারে নি তায়।
আচ্ছা সোজন মানুষ না হয়ে হ'ত যদি ফুল তারা,
চাঁদ যদি হ'ত তখন তাহারে মানাত কেমন ধারা !
তা হলে হয় ত সোজন তাহারে চিনিতেই পারিত না,
হয় হোক সে যে চাষীদের ছেলে, কম তা বলেত না।
বাপ যদি তারে সোজনের সাথে দিয়েই ফেলে বা বিয়ে,
ধ্যেৎ—তা হলে সে কেমনে বাঁচিবে লজ্জা সরম নিয়ে।

সোজনেরো বড় ভাল লাগে এই নমুদের মেয়েটিরে,
তার জীবনের অনেক কাহিনী লেখা আছে এরে ঘিরে।
সোজন যখন বড় হবে খুব—খুব বড় একেবারে,
যখন তখম ইচ্ছা মাফিক যা কিছু করিতে পারে ;

তখন সে হয়ে দূরদেশী কোন পাটের নায়ের ভাগী,
যাবে সে পারায়ে কত খাল বিল সুদূর হাটের লাগি ;
সেথায় জমায়ে বহু টাকাকড়ি ফিরিয়া আসিবে ঘরে,
শপথ করে সে মধুমালা সাড়ি আনিবে তুলীর তরে।
তুলী কহে সেথা সিঁদুর-কৌটো, শঙ্খের চুড়ি আর,
ময়ূরের পাখা যদি মেলে, যেন ভোলে না সে কিনিবার।

সোজন যখন কৃষাণ হইবে, সবগুলো ক্ষেত ভরি'
কুসুম ফুলের করিবে সে চাষ মনের মতন করি।
ফাগুন যেদিন সারা ক্ষেত ভরি আঁকিবে রঙের চিন,
কুসুমে কুসুমে চরণ ঘষিয়া কাটিবে তুলীর দিন।
পাট মেরে সে যে নিড়াইয়া দিবে বউ-টুবানীর চারা,
ক্ষেত ভরি হবে ফুলের বাহার তুলীর খুশীর পারা।
বাড়ীর পালানে কুমড়া লাগাবে, নহে কুমড়ার তরে,
কুমড়ার ফুল ভালবেসে তুলী যদিবা খোঁপায় পরে।

মদনের বাপ ভাল লোক নয়, তাহার ক্ষেতের মাঝে,
মোটরের শাক তুলিতে গেলেই গাল দেয় বড় ঝাঁজে।
বাছাই করিয়া করিবে সোজন মাঘী মটরের চাষ,
শাখ তুলে তুলে সেদিন তুলীর পূরিবে মনের আশ।
জমিরের ক্ষেতে ছাই মিঠে আলু, দেখো সোজনের ক্ষেতে,
শাকের-মামুদ আলু হবে কেউ হেরে নি যা চক্ষেতে।
তুলীর সঙ্গে তার ভারি ভাব, তুলীর খুশীর তরে,
হেন কাজ নাই যাহা কোনদিন সোজন না পারে করে।

৪

দুবলার শীষে যেমন নিহারের পানী
কোন জনা যেইমানে কইছে এই দেহ হাপনি।
বড় ঘর বান্দ্যাছ ও মনাভাই, বড় করছাও আশা,
রজনী প্রভাতের কালে পঙ্খী ছাড়বে বাসা।

—মুর্শিদা গান

দিঘিতে তখনো সাপলা ফুলেরা হাসছিল আনমনে,
টের পায়নিক পাণ্ডুর চাঁদ ঝিমিছে গগন কোণে।
উদয় তারার আকাশ প্রদীপ দুলিছে পূবের পথে,
ভোরের সারথি এখনো আসে নি রক্ত-ঘোড়ার রথে।
গোরস্থানের কবর খুঁড়িয়া মৃতেরা বাহির হয়ে,
সাবধান-পদে ঘুরিছে ফিরিছে ঘুমন্ত লোকালয়ে।
মৃত জননীরা ছেলে-মেয়েদের ঘরের দুয়ার ধরি,
দেখিছে তাদের জোনাকি-আলোয় ক্ষুধাতুর আঁখি ভরি।
মরা শিশু তার ঘুমন্ত মার অধরেতে দিয়ে চুমো,
কাঁদিয়া কহিছে, "জনম দুখিনী মারে, তুই ঘুমো ঘুমো।"
ছোট ভাইটিরে কোলেতে তুলিয়া মৃত বোন কেঁদে হারা,
ধরার আগুনে সাজাবে না আর খেলাঘরটিরে তারা।

দূরে মেঠো পথে প্রেতেরা চলেছে আলেয়ার আলো বয়ে,
বিলাপ করিছে শ্মশানের শব ডাকিনী-যোগিনী ল'য়ে।

রহিয়া রহিয়া মড়ার খুলিতে বাতাস দিতেছে শীষ,
সুরে সুরে তার শিহরি উঠিছে আঁধিয়ারা দশদিশ।
আকাশের নাটমঞ্চে নাচিছে অপ্সরী তারাদল,
দুগ্ধ ধবল ছায়াপথ দিয়ে উড়াইয়ে অঞ্চল।
কাল পরী আর নিদ্রা পরীরা পালঙ্ক লয়ে শিরে,
উড়িয়া চ'লেছে স্বপনপুরীর মধুমালা-মন্দিরে।

হেনকালে দূরে গ্রাম পথ হ'তে উঠিল আজান-গান ;
তালে তালে তার দুলিয়া উঠিল স্তব্ধ এ ধরাখান।
কঠিন কঠোর আজানের ধ্বনি উঠিল গগন-জুড়ে—
সুরেরে কে যেন উঁচু হ'তে আরো উঁচুতে দিতেছে ছুঁড়ে।
পূর্ব্ব গগনে রক্ত বরণ দাঁড়াল পিশাচী এসে,
ধরণী ভরিয়া লহু উগারিয়া বিকট-দশনে হেসে।
ডাক শুনি তার কবরে যাইয়া পালাল মৃতের দল,
শ্মশান-ঘাটায় দৈত্য-দানার থেমে গেল কোলাহল।
গগনের পথে সহসা নিবিল তারার প্রদীপ মালা,
চাঁদ জ্বলে জ্বলে ছাই হয়ে গেল ধরি গগনের থালা।

তখনো কঠোর আজান ধ্বনিছে, সাবধান সাবধান,
ভায়াল বিশাল প্রলয় বুঝি বা নিকটেতে আগুয়ান।
ওরে ঘুমন্ত—ওরে নিদ্রিত ঘুমের বসন খোল,
ডাকাত আসিয়া ঘিরিয়াছে তোর বসত-বাড়ীর টোল।
শয়ন-ঘরেতে বাসা বাঁধিয়াছে যত না সিঁধেল চোরে।
কণ্ঠ হইতে গজমতি হার নিয়ে যাবে চুরি ক'রে।

*   *   *   *

শয়ন হইতে জাগিল সোজন, মনে হইতেছে তার,
কোন্ অপরাধ করিয়াছে যেন জানে না সে সমাচার।
চাহিয়া দেখিল, চালের বাতায় ফেটেছে বাঁশের বাঁশী,
ইঁদুর আসিয়া থলি কেটে তার ছড়ায়েছে কড়ি রাশি।
বার বার করে বাঁশীরে বকিল, ইঁদুরেরে দিল গালি,
বাঁশী ও ইঁদুর বুঝিল না মানে, সেই তা শুনিল খালি।

তাড়াতাড়ি উঠি বাঁশীটি লইয়া দুলীদের বাড়ী বলি,
চলিল সে একা রাঙা প্রভাতের আঁকা বাঁকা পথ দলি।
খেজুরের গাছে পেকেছে খেজুর, ঘন বন ছায়াতলে,
বেথুল ঝুলিছে বার বার ক'রে দেখিল সে কুতূহলে।
ও-ই আগ ডালে পাকিয়াছে আম, ইস্‌রে রঙের ছিরি!
একে ঢিলেতে এখনি সে তাহা আনিবারে পারে ছিঁড়ি।
দুলীরে ডাকিয়া দেখাবে এ সব, তার পর দুইজনে,
পাড়িয়া পাড়িয়া ভাগ বসাইবে ভুল করে 'গণে গণে'।
এমনি করিয়া এটা ওটা দেখি বহুখানে দেরি করি,
দুলীদের বাড়ী এসে পৌছিল খুশীতে পরান ভরি।
"দুলী শোন্ এসে—ওকি রে এখনো ঘুমিয়ে যে রয়েছিস্!
ও পাড়ার লালু খেজুর পাড়িয়া নিয়ে গেলে দেখে নিস্।
সিঁদুরিয়া গাছে পাকিয়াছে আম, শিগ্‌গীর চলে আয়,
আর কেউ এসে পেড়ে যে নেবে না, কি করে বা বলা যায়।"

এ খবর শুনে হুড়মুড় করে দুলী আসছিল ধেয়ে,
মা বলিল, "এই ভর সকালে কোথা যাস্ ধাড়ী মেয়ে?

সাতটা শকুনে খেয়ে না কুলোয় আধেক বয়সী মাগী,
পাড়ার ধাঙড় ছেলেদের সনে আছেন খেলায় লাগি।
পোড়ারমুখীলো তোর জন্যেতে পাড়ায় টেকা ভার,
চূণ নাহি ধারি এমন লোকেরো কথা হয় শুনিবার।”
এ সব গালির কি বুঝিবে দুলী, বলিল একটু হেসে,
“কোথায় আমার বয়স হয়েছে, দেখই না কাছে এসে।
কালকে ত আমি সোজনের সাথে খেলাতে গেলাম বনে,
বয়স হয়েছে এ কথা ত তুমি বল নাই তক্ষণে।
এক রাতে বুঝি বয়স বাড়িল ? মা তোমার আমি আর,
মাথার উকুন বাছিয়া দিব না, বলে দিনু এইবার।”
ইহা শুনি মার রাগের আগুন জ্বলিল যে গিঠে গিঠে,
গুড়ুম্ গুড়ুম্ তিন চার কিল মারিল দুলীর পীঠে।

ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চাহিয়া সোজন দেখিল এ অবিচার,
কোন হাত নাই করিতে তাহার আজি এর প্রতীকার।
পায়ের উপরে পা ফেলিয়া পরে চলিল সমুখ পানে,
কোথায় চলেছে কোন পথ দিয়ে, এ খবর নাহি জানে।
দুই ধারে বন লতায় পাতায় পথেরে জড়াতে চায়,
গাছেরা উপরে ঝালর ধরেছে শাখা বাড়াইয়া বায়।
সম্মুখ দিয়ে শুয়োর পালাল ঘোড়েল ছুটিল দূরে,
শিয়ালের ছাও কাঁদন জুড়িল সারাটি বনানী জুড়ে।
একেলা সোজন কেবলি চ'লেছে কালো কুজ্ঝটি পথ,
ভরদুপুরেও নামে না সেথায় রবির চলার রথ।
সাপের ছেলম পায়ে জড়ায়েছে, মাকড়ের জাল শিরে,
রক্ত ঝরিছে, বেতসের শীষে শরীরের চাম ছিঁড়ে।

এমনি করিয়া বহুখন পরে রায়ের দিঘির পাড়ে—
দাঁড়াল আসিয়া ঘন বেত ঘেরা একটি ঝোপের ধারে।
এই রায়-দিঘি ধাপদামে এর ঘিরিয়াছে কালো জল,
কলমি লতায় বাঁধিয়া রেখেছে কল ঢেউ চঞ্চল।
চারিধারে এর কর্দ্দম মথি বুনো শূকরের রাশি,
শালুকের লোভে পদ্মের বন লুণ্ঠন করে আসি।
জল খেতে এসে গোখুরা সাপেরা চিহ্ন এঁকেছে তীরে;
কোথাও গাছের শাখায় তাদের ছেলম রয়েছে ছিঁড়ে।
রাত্রে হেথায় আগুন জ্বালায় নর-পিশাচের দল,
মড়ার মাথায় শীষ দিয়ে দিয়ে করে বন চঞ্চল।
রায়েদের বউ গলবন্ধনে মরেছিল যার শাখে,
সেই নিমগাছ ঝুলিয়া পড়িয়া আজো যেন কারে ডাকে।

এইখানে এসে মিছে ঢিল ছুঁড়ে নাড়িল দিঘির জল,
গাছেরে ধরিয়া ঝাঁকিল খানিক, ছিঁড়িল পদ্মদল।
তার পর শেষে বসিল আসিয়া নিমগাছটির ধারে,
বসে বসে কি যে ভাবিতে লাগিল, সেই তা বলিতে পারে।

পিছন হইতে হঠাৎ আসিয়া কে তাহার চোখ ধরি,
চুড়ি বাজাইয়া কহিল, "কে আমি বল দেখি ঠিক করি।"
"ও পাড়ার সেই হারাণের পোলা।"—"ইস্।"—"শোন বলি তবে
নবীনের বোন বাতাসী কিম্বা উল্লাসী তুমি হবে।"
"পোড়ারমুখীরা এখনি মরুক্"—"আহা আহা বড় লাগে,
কোথাকার এক ব্রহ্মদৈত্য কপালে চিম্‌টি দাগে।

হয়েছে হয়েছে, বিপিনের খুড়ো মরিল যে গত মাসে
সেই আসিয়াছে, দোহাই। দোহাই।। বাঁচি না যে খুড়ো ত্রাসে।"
"ভারি ত সাহস।" এই বলে দুলী খিল খিল করে হাসি
হাত খুলে নিয়ে সোজনের কাছে ঘেঁষিয়া বসিল আসি।

"একি দুই তুলী?" বুঝিবা সোজন পড়িল আকাশ হ'তে,
চাপা হাসি তার ঠোঁটের বাঁধন মানে না যে কোন মতে।
দুলী কহে, "দেখ্? তুই ত আসিলি, মা তখন মোরে কয়,
বয়স বুঝিয়া লোকের সঙ্গে আলাপ করিতে হয়।
ও পাড়ার খেঁদী, পোড়ার মুখীরে ঝেঁটিয়ে করিব সারা,
আর জগপিসী মায়ের নিকটে যা তা বলিয়াছে তারা।
বয়স হয়েছে আমাদের থেকে ওরাই জানিল আগে,
ইচ্ছে যে করে উহাদের মুখে হাতা পুড়াইয়া দাগে।
আচ্ছা সোজন! সত্যি করেই বয়স যদি বা হ'ত,
আর কেউ তাহা জানিতে পারিত এই আমাদের মত?"
ঘাড় ঘুরাইয়া কহিল সোজন, "আমি ত ভেবে না পাই,
এতদিন মোরা এত খেলিলাম বয়স ত আসে নাই?
আজকে হঠাৎ বয়স আসিল? আসিলই যদি শেষে,
কথা কহিল না, অবাক কাণ্ড দেখি নাই কোন দেশে।"

দুলালী কহিল, "আচ্ছা সোজন, বল্ দেখি তুই মোরে,
বয়স কেমন, কোথায় সে থাকে, আসে বা কেমন করে।"
"তাও না জানিস্?" সোজন কহিল, "পাকা চুল ফুরফুরে,
লাঠি ভর দিয়ে চলে পথে পথে বুড়ো সে যে থুরথুরে।"

"দেখ্ দেখি ভাই, মিছে বলিস্ নে, আমার মাথার চুলে
সেই বুড়ো আজ পাকাচুল লয়ে আসে নাই ত রে ভুলে ?"
দুলীর মাথার বেণীটি খুলিয়া সবগুলো চুল ঝেড়ে,
অনেক করিয়া খুঁজিল সোজন বুড়ো নি সেথায় ফেরে।
দুলীর মুখ ত সাদা হয়ে গেছে যদি বা সোজন বলে,
বয়স আজিকে এসেছে তাহার মাথার কেশেতে চ'লে।
বহুখন খুঁজি কহিল সোজন, "না রে না কোথাও নাই,
তোর চুলে সেই বয়স বুড়োর চিহ্ন না খুঁজে পাই।"
দুলালী কহিল, "এক্ষুণি আমি জেনে আসি মার কাছে—
আমার চুলেতে বয়সের দাগ কোথা আজি লাগিয়াছে ?"

দুলী যেন চলে যায়ই আর কি, সোজন কহিল তারে,
"এক্ষুণি যাবি ? আর না একটু খেলি গে বনের ধারে।"
বউ কথা কও, গাছের উপরে ডাকছিল বৌ-পাখী,
সোজন তাহারে রাগাইয়া দিল তার মত ডাকি ডাকি।
দুলীর তেমনি ডাকিতে বাসনা, মুখে না বাহির হয়,
সেজেনেরে বলে, "শেখা না কি ক'রে বউ কথা কও কয় ?"
দুলীর দু'খানা ঠোঁটেরে বাঁকায়ে খুব গোল করে ধ'রে
বলে, "এইবার শীষ দে ত দেখি পাখীর মতন স্বরে।"
দুলীর যতই ভুল হয়ে যায় সোজন ততই রাগে,
হাসিয়া তখন দুলীর দু'ঠোঁট ভেঙে যায় হেন লাগে।
"ধ্যেৎ বোকা মেয়ে, এই পারলি নে, জীব্‌টা এমনি ক'রে—
ঠোঁটের নীচেতে বাঁকালেই তুই ডাকিবি পাখীর স্বরে।"
এক একবার দুলালী যখন পাখীর মতই ডাকে,
সোজনের সে কি খুশী, মোরা কেউ হেন দেখি নাই তাকে।

"দেখ্‌, তুই যদি আর একটুকু ডাকিতে পারিস ভালো,
কাল তোর ভাগে যত পাকা জাম হবে সব চেয়ে কালো।
বাঁশের পাতার সাতখানা নথ গড়াইয়া দেব তোরে ;
লাল কুঁচ দেব, খুব বড় মালা গাঁথিস্‌ যতন ক'রে।"

দুলী কয়, "তোর মুখ-ভরা গান, দেনা মোর মুখে ভ'রে,
এই আমি ঠোঁট খুলে ধরিলাম দম যে বন্ধ করে।"
"দাঁড়া তবে তুই।" বলিয়া সোজন মুখ বাড়ায়েছে যবে,
দুলীর মাতা যে সামনে আসিয়া দাঁড়াইল কলরবে।
"ওরে ধাড়ী মেয়ে, সাপে বাঘে কেন খায় না ধরিয়া তোরে,
এত কাল আমি ডাইনী পুষেছি আপন জঠরে ধ'রে।
দাঁড়াও সোজন, আজকেই আমি তোমার বাপেরে ডাকি—
শুধাইব, এই বেহায়া ছেলের শাস্তি সে দেবে নাকি ?"

এই কথা বলে দুলালীরে সে যে কিল থাপ্পড় মারি,
টানিতে টানিতে বুনো পথ বেয়ে ছুটিল আপন বাড়ী।
একেলা সোজন বসিয়া রহিল পাথরের মত হায়,
ভাবিবারও আজ মনের মতন ভাষা সে খুঁজে না পায় ?

হায় কাছেম চলিল রণে হাতে বান্ধি কঙ্কনা
শিরে বান্ধি সেহেরা, মেন্দির দাগ গেল না।
এই শোকে আফশোষ, ক'রে কান্দে বিবি সকিনা
জিন্দিগি ভরিয়া পতি আর ত দেখা হ'ল না।

—জারীনাচের গান

মহরমের মাস আসিল, শিমুলতলীর গাঁয়ের সবে ;
জারীর গানে, লাঠির খেলায় মাতলো আবার মহোৎসবে।
আজকে গাঁয়ে নাইক গরীব, আজকে গাঁয়ে নাইক ধনী,
কাহার কত বিত্তে বেসাত আজ তা মোরা কেউ না গণি।
মনীর মিঞা টাকার কুমীর ছমির শেখের বিত্তে ভারি,
রামনগরের নায়েব মশায় থাকুন তিনি তাঁহার বাড়ী।
আজকে ডাক কোথায় আছে মদন কুলু পাতার ঘরে
শিমুলতলীর গাঁয়ের গরব নাচে যাহার লাঠির পরে।
লেংটি পরা ছদন জোলা ডাকে যখন "হজরত আলী"
আকাশ ভেঙে গর্জ্জে ঠাটা, পাতাল ভেঙে মুরছে বালী।
গদাই নমু, রাম বেহারা, বিন্দু নাপিত কোথায় আজি।
সড়কি লাঠি হস্তে লয়ে মালকোছাতে আসুক সাজি।

ছমুর পোলা সোজন, তারে আজকে মোরা আনব ডাকি,
মহরমের করুণ গাথা শুনব তাহার কণ্ঠে রাখি।
আজকে গরব গায়ের জোরের, আজকে গরব বুকের পাটার,
আজকে মোরা মানব নাক কেবা মোড়ল কে তাঁবেদার।

বদরদ্দি জোলার পোলা, নেব তাহার পায়ের ধূলি
মদনপুরের লড়ার কথা আজো মোরা যাই নি ভুলি
বয়স গেছে শ'য়ের কাছে, চক্ষু দু'টি কোটর-গত,
আজ পারে না ধরতে লাঠি নওজোয়ানী কালের মত।
তবু তাহার কায়দা হাতের, তবু তাহার সাহস বুকের,
দশ গেরামের মধ্যে ইহা নয়ক কথা কেবল মুখের।
একশ বছর এমনি ভাবে শিমুলতলী গাঁয়ের হয়ে,
অনেক লড়াই শেষ করেছে জয়ের সুনাম মাথায় বয়ে
তাহার গায়ে একশ' বছর দেছে অনেক লাঠির ক্ষত,
বিত্তি বেসাত যতই থাকুক নয়ক তারা ইহার মত।

শিমুলতলীর গাঁয়ের ছেলে আখড়াতে আজ জিতলে পরে,
অনেক কালের অনেক স্মৃতি বুকখানি তার দেয় যে ভ'রে।
আজকে তারে ঘিরিয়ে মোরা নাচব সবে রুদ্র-তালে;
আরব দেশের করুণ গাথা আনব টেনে সুরের জালে।
নিতাই ধোপা বীরের সেরা, হোক্ না ছোটলোকের ছেলে,
মহরমে মাতব নাক আজকে মোরা তাহায় ফেলে।
রামদা খানি হস্তে লয়ে কালীর নাচন নাচবে যখন,
লহুর গাঙে তুফান তোলে, কণ্ঠে নাচে ঘোর গরজন।

মহরমের দল মিলেছে উল্লাসেতে দিকটি ভরে,
জনমানবের খই ভাজে কে শিমুলতলীর মাঠের পরে।
সাত আটটা হাটের যেন গণ্ডগোল কে এক করিয়া,
রেখেছে এই মাঠের মাঝে নর-মুণ্ডের জাল ঘিরিয়া।

মধ্যে তাহার জারীগানের চলছে তুফান কণ্ঠ চিরে,
কারবালারি করুণ কাঁদন ঢেউ খেলিছে নয়ন নীরে।
ওধার দিয়ে আছেন ব'সে গাঁয়ের যত বৌ-ঝিরা সব,
ছেলের দলে এধার দিয়ে করছে মৃদু কলকল রব।
আর দু'ধারে জুয়ান, বুড়ো নমুর সাথে মুসলমানে,
চোখের জলে জল মিশায়ে শুনছ কথা বিষাদ-প্রাণে।

সোজন আজি নতুন গায়েন, লাল গামছা ঘুরিয়ে শীরে,
মহরমের নাচন নেচে গান গাহে তার দলটি ঘিরে।
সখিনা তার বিয়ের দিনে ভাঙল গলার হাঁসলীখানি,
কারবালারি দুখের দহে ভাসল তাহার ছোড়মাদানী।
মরা পতির লাশ লইয়া দুল দুল যে আসল ফিরে,
এখনো সেই বিয়ের সাড়ী সখিন'রে রইছে ঘিরে।
নয়ন জলে কূল হারাল তাহার চোখের সুরমা রেখা,
অভাগিনী আর পাবে না তাহার নয়া পতির দেখা।
সমর সাজে সাজিয়ে যারে পাঠিয়েছিল কারবালাতে,
তারে আজি গোরের কাফন পরাবে সে কোন্ বা হাতে ?

স্মৃতির আগুন দ্বিগুণ জ্বলে জল ঢালিলে নেবে না হায়,
হাতে পায়ে লাল মেহেদী মুছতে গেলে মুছতে না চায়।
কান্দে কান্দে হায় সখিনা, ছিঁড়িয়া তার মাথার বেণী,
দুঃখে তাহার বাবলা বনে দুম্বা শিশু মুখ মেলেনি।
সেই কাঁদনে শিমুলতলী গাঁয়ের পরান উঠছে দুলে,
কারবালারি দুখ-দরিয়ার ঢেউ এসে তার ভাঙছে কূলে।

কেঁদে কেঁদে গায় যে সোজন, সুর যেন তার বাঁশের বাঁশী ;
শাহারবানুর পুত্রশোকে শিমুলতলী যায় যে ভাসি।
মাঝে মাঝে গান থামায়ে দলের সবার হাত ধরিয়া—
কখন নাচে ঘুরিয়ে বাহু, কখন নাচে ঘাড় নুইয়া।
এমনি করে দুঃখ দিনের শেষ হইল সকল ব্যথা—
আবার সোজন আরম্ভিল চাচা ভাজ্‌তের লড়াই কথা।
কারবালারি বিষাদ গাথা মামুদ হানিফ শুনল যবে,
কেউটে সাপের তুলল ফণা সাপ-নাচান বাঁশীর রবে।
কোথায় এজিদ-হায় কমবখ্‌ত, আজকে তোরে মুঠায় পেলে,
বাঘের মত পাঁজর ছিঁড়ে টুকরো করে দিতাম ফেলে।
সিংহ যেমন হরিণ ধরে, ইঁদুর ধরে যেমন সাপে,
সামনে পেলে মামুদ হানিফ তেমনি তারে ধ'রত দাপে।
হুহুঙ্কারে ডাক ছাড়িল মামুদ হানিফ উচ্চরবে,
মদিনাতে রণের ভেরী বাজল আজি মহোৎসবে,
তালেব আলী, আক্কেল আলী যেন দু'টি জেন্দা কামান,
হুঙ্কারেতে আগুন জ্বালি আকাশ জমিন পোড়ায় তামান।
সাজে মর্দ্দ বীর বক্স—সাজে মর্দ্দ জহর গালী,
ঝনঝনিয়ে বাজায় কৃপাণ, ঢাল ঝুলিয়ে হাজার ঢালি।
বেড়িয়ে তাদের গর্জ্জে হানিফ—গর্জ্জে যেন গজব খোদার,
আকাশ ভুবন উপ্‌ড়িয়ে আজ করবে তারা এক একাকার।

আজকে তারা দাদ্‌ লইবে কারবালার এ অত্যাচারের,
পারবে না কেউ পারবে নাক থামাতে আজ হিংসা তাদের।
প্রলয় নাচন নাচে হানিফ হাজার সেনা সঙ্গে নিয়ে,
দাবানল আজ নাচছে যেন বনের বুকে আগুন দিয়ে।

সেই আগুনের প্রলয়-শিখা হাজার বছর পার হইয়া,
পলে পলে আগুন জ্বালায় বেড়ে' মানব-মনের হিয়া।
সেই আগুনে জ্বলছে আজি শিমুলতলী গাঁয়ের সবে,
এবার তা'রা মাতবে যেন বহ্নি-নাগের মহোৎসবে।
সোজনের আজ কণ্ঠ হ'তে বারুদ যেন বাহির হয়ে
আছড়িয়ে সে পড়েছে ছুটে সে আগুনের ধ্বংসালয়ে।
দিকে দিকে নাচে আগুন—নাচে আগুন দিগন্তরে,
মধ্যে তাহার নাচে সোজন, কণ্ঠ হ'তে বহ্নি ক্ষরে।

সেই নাচনের রুদ্র-তালে বুঝি মনের অগোচরে
শিমুলতলী গাঁয়ের সবে ঘিরিয়ে তারে নৃত্য করে।
কখন জানি মদন জোলা ঘূর্ণি পাকে রামদা হানি'
এমন নাচন নাচছে যেন ফেলবে ভেঙে জগৎখানি।
গদাই মোড়ল ঘুরায় লাঠি, মদন জোলা নাচায় খাঁড়া,
ক্ষ্যাপা মোষের দলকে আজি কে দিয়েছে হঠাৎ তাড়া।

নিতাই ধোপা কৃপাণ লয়ে নাচে যেন করাল কালী,
হি হি হি হি ডাক ছাড়িয়া দিকে দিকে আগুন জ্বালি'।
ছিঁড়ছে আকাশ, ছিঁড়ছে জমিন নখে নখে আঁচড় দিয়া—
আজ যেন সে সপ্তধরার লহুর সাগর পান করিয়া,
অট্ট অট্ট হাসিয়ে বামা কখন কখন মূর্চ্ছি পড়ে,
তাণ্ডবিনীর হুঙ্কারেতে সূর্য্য নড়ে আকাশ নড়ে।
আবার কভু ডাক ছাড়িয়ে কেঁদে উঠে থাপড়িয়ে বুক
উন্মাদিনী বুক ভরেছে লয়ে সে কি দুঃসহ দুখ।
কোলের ছেলে বক্ষ হ'তে ছিনিয়ে নেছে দস্যু বুঝি,
কেঁদে কেঁদে পথ ভিজাবে আজ সে তারে একলা খুঁজি।

শোধ নেবে সে—শোধ নেবে তার—যে করেছে বক্ষ খালি,
ক্রোধ-দীপ্ত ডাক ছাড়িয়া নাচে বামা উগ্র কালী।

সেই নাচনের রুদ্রতলে আরম্ভিল লাঠির খেলা,
কাহার কত বুকের পাটা দেখাবে সে আজ এ বেলা।
ছেলেয়-ছেলেয় বুড়োয়-বুড়োয় যোয়ান-যোয়ান জোড়ায়-জোড়ায়,
তাল পাকিয়ে ডাক ছাড়িয়ে লাঠির খেলায় আসর জমায়।

ঢলুর খেলার হাতটি ভাল, ছদন কেবল নাচতে জানে,
রহিমকে আজ বস্‌তে বল, জানেই না সে খেলার মানে।
ওই ক্ষেপেছে মদন কুলু, যেমন নাচে তেমনি খেলে,
সাত গেরামে উহার মতন লাঠির খেলায় জোড় না মেলে।
জগা খেল্‌বে উহার সাথে—ওই দেখ না একটি পাকে
বসিয়ে দিল লাঠির বাড়ি মদন তাহার মাথার টাকে।

এমন সময় সোজন বলে, “মদন চাচা তোমার সনে
পারবো না সে জানিও যদি, ইচ্ছে তবু খেলতে মনে।”
মদন বলে, “বেশ মোর বাপ—চোল-মারা হাত, এই এক হাত—
এই মারিলাম, ফিরিয়ে দিলে, ক্যাবাত বাপ, ক্যাবাত বাত।”
দুইজনেতে লাগল খেলা ঘুরিয়ে লাঠি ঘূর্ণি পাকে,
কুমোর যেমন ঘুরায় চাকা, মেঘে যেমন বিজলী হাঁকে।
ঘুড়ির সাথে ঘুড়ির সাথে কাটাকাটি লাগলো কি আজ,
সাপের সাথে বেঁজীর লড়াই—বাজের সাথে লড়ছে কি বাজ।

এক-হাতি খেল, দুই-হাতি খেল, তিন হাতি খেল করল সারা—
চার-হাতি খেল খেলতে সোজন লাঠিতে তার মারল ঝাড়া।
মদন কুলু ঘুরিয়ে লাঠি যখন জোরে মারল বাড়ি,
ছোঁ মারিয়া সোজন তখন লাঠি তাহার ফেললো কাড়ি।

মদন বলে, "সাবাস্ জোয়ান, শিমুলতলী গাঁয়ের খ্যাতি—
রাখ্‌তে তুমি পারবে, এতে ফুল্‌ছে আমার বুকের ছাতি—
এই যে লাঠি ভাল্‌কে-বাঁশের আমার বাপের বাবার হাতের
সারা জীবন করছি লড়াই রাখতে বজায় ইহার খাতের।
কাজলডাঙার নিজাম খুনী গড় করেছে ইহার তলে,
এই লাঠিতে জয় করেছি পাথারখালির নমুর দলে।
এই লাঠিতে তাল্‌মা হাটে বন গেঁয়োদের হারিয়ে দিয়ে,
শিমুলতলী গাঁয়ের সুনাম এসেছিলাম ঝুলিয়ে নিয়ে।
সেই লাঠি আজ কাড়লে তুমি, দীর্ঘ তিরিশ বছর ধরে,
এই লাঠিরে ফিরছি সেধে মহরমের এই আসরে।
কেউ লয় নি—ভেবেছিলাম যেদিন লব গোরের মাটি,
ধূলায় সেদিন থাকবে পড়ে এত সাধের হাতের লাঠি।
সেই লাঠি যে কাড়লে তুমি, আজকে আমার ইচ্ছে করে,
আকাশ জমিন বেড়িয়ে নাচি তোমায় আমি মাথায় ধরে।
শিমুলতলী গাঁয়ের বাঁশে তৈরী যে এই হাতের লাঠি,
থাকতে হাতে দেখিস্ যেন হয় না বে-হাত ইহার মাটি।"

এমন সময় একটা কিছু সামান্য কি কারণ লয়ে,
নমু মুসলমানের লড়াই বাধলো হঠাৎ জমাট্ হয়ে।
যখন বনে আগুন লাগে জল ঢালিলে ফল কিবা তায়,
যতই চাহে থামিয়ে দিতে হল্লা ততই জোরসে ঘনায়।

সাউদ পাড়ার খাঁ-দের সাথে শিমুলতলীর ছিল বিবাদ
নমুরে আজ সামনে পেয়ে অনেক দিনের নেবে যে দাদ।
ভাজনপুরের শেখরা এসে মিলল সাউদ পাড়ার দলে
সড়কি লাঠি হস্তে বয়ে মাতলো তারা লড়াই রোলে।
মুসলমানের উৎসবেতে নমু ছিল অনেক যে কম,
পরাণ পণে খানিক যুঝি মার খাইল সবাই বেদম।
কারো ভাঙল পায়ের নলা, কারো ভাঙলো কব্জি হাতের—
দাদ লইবে, ফণায় লাথি যে মেরেছে গোখরো সাপের।

৬

গুয়া গুয়া জোড়া পান
মশামাছি ধইরা আন।

—বশীকরণের মন্ত্র

* * *

এক হাতে হাতুন, আর হাতে কুলা
আধ অঙ্গ লাল, আধ অঙ্গ কালা।
বাঘের পৃষ্ঠে দেবী যায়
সামনে পাইলে ধইরা খায়,

—বসন্ত রোগের মন্ত্র

রামনগরের নায়েব মশায়, যম যেন বা স্বয়ং ব'সে,
ভিটে নিলেম ডিগ্রীজারী করেন বাকী খাজনা কসে।
সেলামী আর নজর-আনা কিস্তি-খেলাপ সুদের বোঝায়,
ভুঁড়ীর উপর বাড়ছে ভুঁড়ী, দিনে যতই দিন চলে যায়।
ইহার উপর 'মাথট' আছে 'বাড়তি' আছে, 'কমতি' আছে,
যেদিকে চাও হাত বাড়ালে হাত যে ঠেকে টাকার গাছে।
ঘড়ি ঘড়ি বাজছে টাকা, সামনে দিয়ে পিছন দিয়ে,
কানে কানে কান-কথাতে চোখ-টেপাতে ঝনঝনিয়ে।

রামনগরের নায়েব মশায়, কানে তাঁহার কলম গোঁজা ;
ছোট হলেও সেই কলমের ইতিহাসটা নয়ক সোজা।

তারি একটা আঁচড় লেগে গেছে কত চালের ছানি,
কত ভিটেয় চরছে ঘুঘু, ইহার হদিস্ আমরা জানি।
সেই কলমের খোঁচায় খোঁচায় খুঁড়েছে সে অনেক কবর,
তাহার তলে ঘুমায় যারা, কেবা রাখে তাদের খবর?
—সেই কলমের আঘাত পেয়ে খুলি' মাথার সিঁদুর খানি,
অনেক নারী স্বামীরে তার দিয়েছে হায় চিতায় টানি।
গাজনতলার দবির জোলা সাতটি বছর খাটল জেলে,
ইতিহাসটা আজো তাহার ওই কলমের আগায় মেলে।
কলুরটিলায় নমুর পাড়া, রাত দুপুরে আগুন জ্বালি—
ওই কলমের সহজ স্বরূপ দেখেছি ত অনেক কালই।

রামনগরের নায়েব মশায়, দেব্‌তা রহেন মন্দিরেতে;
পরব মতন বেল-পাতা-ফুল মাঝে মাঝে চাহেন খেতে।
আল্লা রহেন মস্‌জিদেতে, সিন্নি মানি নামাজ পড়ি,
ঈদের চাঁদে উপোস রহি, আমরা তারে শান্ত করি।
না করিলে মজিদ ছেড়ে আল্লা কভু হন্ না বাহির,
দেব্‌তারেও ভোগ না দিলে নাইক বালাই জবাবদিহির।

রামনগরের নায়েব মশায়—আল্লা নহে, হরিও নহে,
কারণ তাহার পূজার বেদী যেখানে যাও সেথায় রহে।
চলন্ত পা-গাড়ীর মত চলন্ত এই দেব্‌তা নিজে,
ঘুরে ঘুরে আদায় করেন, লাগবে পূজোয় কাহার কি যে।
জমা উস্লুল, বকেয়া বাকী, সেলামী আর নজর-আনা,
কিস্তী খেলাপ করবে যে এর ডুববে তাহার কিস্তীখানা।

ডিগ্রীজারী—ডিগ্রীজারী—হুকুম তামিল করবে না কে ?
ভিটেয় তাহার চরাও ঘুঘু, চড়ক-পাকে ঘুরাও তাকে।
ডিগ্রীজারী—ডিগ্রীজারী—ঘটি বাটি আন ছিনিয়ে।
বধূর নাকের নথ কেড়ে আন, লাথিতে তার মুখ ভাঙিয়ে।
ডিগ্রীজারী—ডিগ্রীজারী—ঝড়কে যারা ভয় না করে—
পদ্মা সনে সমান যুঝি বসত করে বালুর চরে।
হিংস্র বাঘে তাড়িয়ে যারা গহন বনে গ্রামে রচিল,
গোখ্‌রো সাপের বিষ কাড়িয়া 'জারল-বিষের' বেসাত দিল।
চড়ক পূজোয় শ্মশান ঘাটায় স্যাওড়া তলার প্রেতের সাথে,
আজো যারা ডাক-ডাকিনী ভূত পিশাচের নৃত্যে মাতে—
তাদের কাছে ডিগ্রীজারী—ডিগ্রীজারী—ডিগ্রীজারী ;
'গড়ুলী' ওই মন্ত্র কেবা নাগের মাথায় যায় যে ঝাড়ি।
কোন শিরালীর কিষাণ বাজে বৃষ্টি শীলা তুফান রোলে ?
ভূতান্তরী মন্ত্র পড়ি থামালো কে ভূতের দলে ?

ডিগ্রীজারী—ডিগ্রীজারী—অন্ন নাহি, বস্ত্র নাহি—
কাঁদুক খোকা আহার বিনে, জমিদারের খাজনা চাহি।
খাজনা চাহি—খাজনা চাহি—দুধ না পেয়ে মরুক মেয়ে ;
বস্ত্র বিনে ঘরের বধূ গলায় রশি দিক্ না যেয়ে।
ডিগ্রীজারী—ডিগ্রীজারী—লাঙল শুধু মাটিই ফাড়ে,
লাঠিতে আজ ঘুণ ধরেছে পড়ে না আর কাহার ঘাড়ে।
ডিগ্রীজারী—ডিগ্রীজারী—জমিদারের ছেলের বিয়ে,
দাখিলা আজ কাটব নাকো, টাকায় আনার কম না নিয়ে।
মেয়ের হবে অন্নপ্রাশন, ডিগ্রীজারী—ডিগ্রীজারী—
দাখ্‌লে প্রতি এক আধুলী, বাপ হ'লেও তায় না ছাড়ি।

বানে শুধু ডোবায় ফসল, আর যে ডোবায় বসত্ বাড়ী,
জমিদারের 'পোলার' বিয়ের হয় না কিছু জন্যে তারি।
ডিগ্রীজারী—ডিগ্রীজারী—ঘোর-পাকেতে ঘুরছে চাকা,
সঙ্গে তাহার আসছে সেলাম, সঙ্গে তাহার বাজছে টাকা।
রামনগরের নায়েব মশাই সেই চাকারে হস্তে ধরে'
স্বয়ং শূলচক্রপাণি বিরাজ করেন গ্রামের 'পরে।

সেদিন রাতি প্রহরখানেক, বসে আছেন নায়েব মশায়,
মনটি তাহার উধাও কোন্ মামলা-মোকর্দ্দমার কথায়।
এমন সময় পদধূলি লওয়ার ঠেলাঠেলীর তরে,
নায়েব মশায় চক্ষু খুলি সামনে দেখেন নজর ক'রে।
শিমুলতলীর গদাই নমু আর এসেছে বিন্দু নাপিত,
আর এসেছে নিতাই ধোপা, পঞ্চাশ জন নমুর সহিত।
শিমুলতলীর গদাই নমু। চাঁড়াল, আজি নেড়ের সনে,
যোগ করিয়া সরার মতই ধরাটাকে ভাবছে মনে।
জমিদারের হাট বসিবে শিমুলতলীর গাঁয়ের পরে ;
হুকুম দিলেন নায়েব মশায়, গ্রাম ছেড়ে সব যাওগে সরে।
সোজা কথায় বলতে গেলেই ছোটলোকের বাড় বেড়ে যায়,
বলে কিনা, কোথায় যাব গ্রাম ছাড়িয়া, নায়েব মশায়।
কোথায় যাব ? নায়েব যেন ওদের বাবার বাবার চাকর ;
কর্ত্তারা সব কোথায় যাবেন, বলতে হবে তারও খবর।
বন-বাদাড়ে চক-পাথারে, যেথায় খুশী যাস্ না চলে,
শিমুলতলী হাট বসিবে সোজা কথায় দিলুম বলে।
কত বড় বুকের পাটা জমিদারের হুকুম ঠেলে—
শিমুলতলী গাঁয়ের পরে আজো হেসে ফিরছে খেলে।

দেখে নেব, দেখেই নেব, দেওয়ানী কোর্ট খুলুক আগে ;
ডিগ্রীজারী আনব ডেকে, দেখ্‌বি তখন কেমন লাগে।
নেড়ের সাথে মিলছে চাঁড়াল, বেশী কিছু বল্লে পরে—
ভাল মন্দ অনেক কিছুই ঘটতে পারে কপাল জোরে।
সাপ নিয়ে ত খেল্‌ছে খেলা, ভালই জানে নায়েব মশাই ;
অনেক ছলা, অনেক কলার জাল টেনে তাই ফেরেন সদাই।

গুড়গুড়িতে টান্ মারিয়া খানিক কেসে খানিক হেসে
বল্লে, "কে হে গদাই মোড়ল, খবর বলে সাম্‌নে এসে।"
পায়ের ধুলো আবার নিয়ে, হাত দু'খানি জোড় করিয়া
বল্লে গদাই, "নায়েব মশাই, কইব কি বুক যায় ফাটিয়া।
মহরমের মেলার পরে মিলে যত মুসলমানে
এমন মারই মারছে মোদের, বেঁচে আছি কেবল প্রাণে।"

"কি বলিলি গদাই মোড়ল," গর্জ্জি উঠেন্ নায়েব মশায় ;
জালী-কলার পাতার মতন গা কাঁপে তার রাগের জ্বালায়।
"নমুর মাথায় লাগায় বাড়ি, এতই সাহস নেড়ের বুকে,
গোখ্‌রো সাপের লেজুর ছিঁড়ে আজো তারা ঘুমায় সুখে ?
ইঁদুরে আজ মারল লাথি কাঠবেড়ালীর মাথার 'পরে,
উদের গলায় মাছের কাঁটা বিঁধলো বুঝি কপাল জোরে।

"কি করিব নায়েব মশায়," বলে গদাই ঢোক্ গিলিয়া,
সাতটা গ্রামের মুসলমানে এলো যখন দল বাঁধিয়া—
মোরা তখন ভড়্‌কে গেলাম, নইলে পরে দেখেই নিতাম্,
আপনি এখন কি যুক্তি দেন্, তাই এখানে জানতে এলাম।"

রুখে বলেন নায়েব মশায়, "আমায় হবে যুক্তি দিতে।
শিমুলতলীর গদাই মোড়ল পিঁপ্ড়ে খেদায় তার লাঠিতে ?
নিতাই ধোপা নাই কি গাঁয়ে, সড়কীতে কি ঘুণ ধরেছে ?
মধুর পোলা বিন্দু নাপিত গাঁও ছেড়ে কি পালিয়ে গেছে ?
গউর মাঝির রামদা কোথায়, দুখীরামের কোথায় কুঠার ?
কালুর বেটা কানাই রামের জুতোর ফালে নাই কি রে ধার ?"
"সবাই আছে নায়েব মশায়, আমরা শুধু হুকুম চাহি ;"
গদাই বলে, "আপনি ছাড়া আর আমাদের সহায় নাহি।"
"হুকুম চাহিস্ ?" নায়েব মশায় এবার যেন ক্ষিপ্ত হয়ে
লাফিয়ে উঠে বল্লে, "দাঁড়া আস্‌ছি আমি হুকুম লয়ে।"

* * * *

খানিক পরে এলেন ফিরে, কপালে তার সিঁদূর মাখা,
চক্ষু দু'টি কাঁপছে রাগে যেন দু'টি অগ্নি-চাকা।
হাতে তাহার সদ্য গাঁথা রক্ত জবার দুলছে মালা,
ছিন্ন ফুলের মুণ্ড বেয়ে ঝরছে যেন লহুর জ্বালা।
"হুকুম চাহিস্—হুকুম চাহিস্," গর্জ্জি বলে নায়েব মশায়
"হুকুম তবে আসুক নেমে কালবোশেখির ঘূর্ণি-দোলায়।
হুকুম তবে নৃত্য করুক গোখ্‌রো সাপের মাথার পরে,
হুকুম তবে হাস্য ছড়াক শিমুলতলীর হাজার গোরে।
হুকুম চাহিস্—হুকুম চাহিস্, হুকুমে মোর অগ্নি ঢালা,
শিমুলতলীর কে আসি আজ পরবে গলে ইহার মালা ?"
গর্জ্জি বলে গদাই মোড়ল, গর্জ্জি বলে রাম বেহারা,
"যতই কেন আগুন জ্বলুক সেই মালা আজ পরবে তারা।"

"পরবি তবে, পরবি গলে?" নায়েব মশায় উচ্চে শুধায়,
চোখ দু'টিতে উল্কা জ্বলে, কণ্ঠে তাহার অগ্নি খেলায়;
"পরবি তবে পরবি গলে রক্ষাকালীর পূজার মালা,
ফুলে ফুলে ঝরছে ইহার ছিন্ন শিরের রক্ত জ্বালা।
এই মালা আজ জড়িয়ে শিরে ঘোলাটে মেঘের দল ছুটে আয়,
বৃষ্টিশিলা সঙ্গে লয়ে পবন-রাজের ঘূর্ণি-দোলায়।
আয় ছুটে আয় ডাক ডাকিনী, আয় ছুটে মা শ্মশানকালী,
উগ্রকালী মুণ্ডমালী বহ্নিনাগের মশাল জ্বালি।"
এই বলিয়া নায়েব মশায় একে একে সবার গলে
রক্ষাকালীর পূজার মালা পরিয়ে দিল মনের ছলে।

প্রণাম করে সব নমু কয়, "হুকুম চাহি নায়েব মশায়,
এই মালা আজ কণ্ঠে পরে করতে হবে কি আজ আদায়?"
নায়েব কহে, "রাত দুপুরে মুসলমানের ভাঙবি পাড়া,
শিমুলতলীর গেরাম হ'তে কাজকে তাদের করবি ছাড়া।
সামনে যারে যেথায় পাবি খাঁড়ার ঘায়ে মুণ্ড নিবি,
নেড়ের লাঠি নমুর ঘাড়ে, আজকে তাহার দাদ লইবি।"

কেঁদে বলে নিতাই ধোপা, "নায়েব মশায়, প্রণাম পায়ে
ফিরিয়ে নাও ফুলের মালা, যাইগে চ'লে আপন গাঁয়ে।
দশ গেরামের মুসলমানে মারল যখন নমুর দলে,
শিমুলতলী গাঁয়ের যারা, তাদের মারি কিসের ছলে?
বরং তারা মোদের হয়ে সবার হাতে খেয়েছে মার
ভিটে বাড়ী শূন্য করে আমরা আজি শোধ নেব তার?"

রোষে বলেন নায়েব মশায়, "চাঁড়াল কেন বলবে তবে,
পাতি-নেড়ের মার খাবি কেন্ মাথায় যদি বুদ্ধি র'বে।
বলতে পারিস্ তফাত কোথা মুসলমানে মুসলমানে ?
মাথায় যদি মারিস্ লাঠি সব গায়ে তার বেদ্‌না হানে।
মহরমের মার খেলি আজ কালকে খাবি হাটের মাঝে ;
তার পরেতে চকপাথারে হাটে বাটে সকল কাজে।"

গদাই বলে, "নায়েব মশায়, বুঝি যদি সকল কথা,
তবু ওদের মারতে যেন বুক ভরিয়া জম্‌ছে ব্যথা।
জানি ওরা সংখ্যাতে কম, আমরা যদি দাঁড়াই রুখে
বাঘের মত ছিঁড়তে পারি পাঁজর ধরে ওদের বুকে।
তবু ওদের মারতে মনে অনেক কথাই আজকে জাগে,
ওদের বুকে হান্‌লে লাথি আঘাত যেন মোদের লাগে।
এক গেরামের গাছের তলায় ঘর বেঁধেছি সবাই মিলে,
মাথার উপর একই আকাশ হাসছে নানা রঙের নীলে।
এক মাঠেতে লাঙ্গল ঠেলি, বৃষ্টিতে নাই রৌদ্রে পুড়ি,
সুখের বেলায় দুখের বেলায় ওরাই মোদের জোড়ের জুড়ি।
দোহাই দোহাই নায়েব মশায়, ফিরিয়ে নাও হুকুম তব ;
চাঁড়াল মুচি যা বল না, ওদের সাথে তাহাই হ'ব।"

নায়েব মশায় উঠল রুষে, হুঙ্কারে তার আগুন জ্বলে,
"হারামজাদা চাঁড়াল তোরা সামনে হ'তে আজ যা' চলে'।
আমার হুকুম মানলি না ক, ডিগ্রীজারী—ডিগ্রীজারী ;
ভাঙব বাড়ী, লুঠব বেসাত, যা'ক না আরো দিন দু' চারি।

মাঠের জমি ক্রোক্ করিব, বাঁশগাড়ীতে ঢোল বাজায়ে,
ভিটেয় নাহি চরলে ঘুঘু নাম রাখিব নাম ফিরায়ে।"
বিন্দু নাপিত পাও ধরি কয়, "নায়েব মশায়, নায়েব মশায়,
আর কোন কি আদেশ নাহি ইহা ছাড়া তোমার হেথায়?"
"নাহি নাহি," নায়েব কহে হুঙ্কারেতে আকাশ ফাড়ি,
"রাতারাতি সকল নেড়ের ভাঙবি শিমুলতলীর বাড়ী।"
"তাহাই হবে, নায়েব মশায়," সকল নমু ডাক দিয়া কয়,
"পিছে যাওয়ার পথ যদি নাই, সামনে চলি হোক যাহা হয়।"
নায়েব বলেন, "এই ত সাবাস্ মহামায়ার ভক্ত তোরা,
রক্তখাকীর আদেশ আজি পালন করে আয় গে ত্বরা।"

বাইরে তখন কৃষ্ণরাতের অন্ধকারে ঢেউ তুলিয়া
গাজনতলীর বিলের মাঝে প্রেত চ'লেছে আলোক নিয়া।
থেকে থেকে বনের মাঝে ডাক দিতেছে হুতুম্ পাখি,
নিশীথিনীর তিমির বুকে গাঢ়তম তিমির মাখি।

৭

ঘরখানি বান্দ সোনা তাই দুয়ারখানি ছান্দ,
আপনি মরিয়া যাইবা তার লাইগা নি কান্দ।

রজনী তখন প্রভাত হয়েছে, শিমুলতলীর ম'জিদ ঘরে
মুসলমানেরা মিলিয়াছে আসি না জানি তাহারা কিসের তরে।
এক পাশে তার মাটির চেরাগ ঘুরিয়া ঘুরিয়া বায়ুর সনে
এর মুখ হতে ওর মুখ পানে চাহিয়া কি যেন দেখিছে গণে'।
ঊর্দ্ধে আকাশে চাঁদ নাই আজ, চুপি চুপি তাই তারারা যত
আলোরে লইয়া খণ্ড করিয়া লুটিয়া লইছে যে যার মত।
শেষ রাত্রের উদাসী বাতাস থাকিয়া থাকিয়া বহিছে বেগে,
পাতায় পাতায় ফিস্‌ফিস্ কথা কা'রা যেন আজ কহিছে জেগে
ম'জিদের ঘরে বহু লোক জমা, বুঝিবা তাহারা প্রদীপ জ্বালি
নীরবতার কি রূপ আঁকি যেন পড়িয়া পড়িয়া দেখিছে খালি।
গোরস্থানের মৃতেরা উঠিয়া বুঝি এ নীরব নিশির সনে—
গত জীবনের সকল কাহিনী মনে মনে তারা দেখিছে গণে।

এমনি করিয়া বহুখন গেল, পরে একে একে উঠিয়া তারা—
বাহিরের ঘন অন্ধকারেতে গা মিশায়ে সবে হইল হারা।
ভাঙা মস্‌জিদ, তারি এক কোণে একাকিয়া সেই প্রদীপখানি
ঘুরিয়া ঘুরিয়া আঁধারের বুকে সোনার আঁখর চলিল টানি।

গাঁর ঘরে ঘরে ফিস্ ফিস্ কথা অতি সাবধানে কহিছে কারা,
শব্দবিহীন চরণ ফেলিয়া আসে আর যায় ব্যস্ত পারা।
জিনিসপত্র কেহবা বাঁধিছে, কেহবা লইছে মাথায় করে',
কেহবা হ'তেছে ঘরের বাহির ঘুমন্ত ছেলে বক্ষে ধরে'।
কারো মুখে আজ কোন কথা নাই, আঁধারে কিছুই যায় না দেখা,
ইঙ্গিতে শুধু সারিতেছে কাজ, পড়া যায় নাক মুখের রেখা।

হেন কালে দূর ম'সজেদ হ'তে উঠিয়া করুণ আজান্-গান,
রাতের আঁধারে জড়াজড়ি করি দূর বন-পথে হারাল তান।
সেই সুর শুনি কাতারে কাতারে মুসলমানেরা ম'জিদ ঘরে
মিলিল আসিয়া নীরব চরণে, অধর কাঁপে কি শঙ্কা ভরে।
সামনে দাঁড়ায়ে মনিব মুন্সী, বয়স তাহার আশীর কাছে,
ঘন সাদা দাড়ী প্রশান্ত মুখে মমতার মত জড়ায়ে আছে।
সামনে লইয়া কোরান শরীফ সুরে-ফতেহার চরণ পড়ি
সারে জাহানের ক্রন্দনে যেন চোখ দু'টি তার আসিছে ভরি।
রোজ-হাশরের পড়িছে বয়ান, নিশীথিনী যেন অলক-ভার
আঁধারে আছাড়ি শান্ত করিতে চাহিতেছে কোন্ বেদনা তার।
দীনের রসুল কেয়ামত-দিনে খোদাতাল্লার আরশ ধরি
যেমন করিয়া কাঁদি উঠিবেন নিখিল নরের ভাগ্য স্মরি।
সেই ক্রন্দন আসিয়াছে যেন তাহার কোরান পড়ার সুরে ;
গাছ-পাতা-লতা-পশু-পাখী যত, সাথে সাথে তার কাঁদিছে ঝুরে
কোরানের সুর, যেন ঘোর রাতে লায়লীর একা কবর পরে—
অভাগা মজনু মোমের প্রদীপ জ্বালাইয়া কাঁদে দুখের ভরে।
মুন্সীসাহেব পড়িছে কোরান, চোখ দু'টি তার ভরিছে জলে,
আবেগের পর আবেগ আসিয়া জড়াইছে কথা তাহার গলে।

তার পর শেষে কোরান রাখিয়া কহিলেন, "শুন সকল ভাই,
আজ হ'তে আর শিমুলতলীতে আমাদের তরে নাহিক ঠাঁই।
এই ম'স্‌জিদে শেষ নামাজের জামা'তে আজিকে হইয়া খাড়া
আর কিছু মোরা নাহি ভাবি যেন সারে জাহানের মালিক ছাড়া।
এসো ভাই, মোরা মোনাজাত করি হাত উঠাইয়া খোদার কাছে।"
এমন সময় ছমির লাঠেল উঠে বলে, "মোর আরজ আছে।
মুন্সীসাহেব। জানি আমি জানি অনেক বোঝেন আমার থেকে,
আজি আপনার বুদ্ধি বুঝিতে চেষ্টা করেও গেলাম ঠেকে।
হাতের লাঠি এ হাতে থাকিতেই বিনা কাইজায় ছাড়িলে গ্রাম,
শিমুলতলীর মুসলমানের ঘৃণায় যে কেহ লবে না নাম।
মরি আর বাঁচি বাপের ভিটায় রহিব আমরা কামড়ি মাটি,
আজরা'ল যদি সামনে দাঁড়ায়, হেথা হ'তে কেহ যাব না হাঁটি'।
কি বল ভাইরা—বুকের পাটায় হাত দিয়ে আজ বল ত সবে,
চোরের মতন পলায়ে যাবে কি মানুষের মত হেথায় রবে?
সবাই উঠিল কলরব করি, "পালাব না মোরা কিছুতে নয়,
হয়ত হেথায় বাঁচিব, নতুবা করিব এ গাঁও কবর-ময়।

সোজন তখন কহিল উঠিয়া থাপড় মারিয়া আপন বুকে,
"যাবে যারা যাও, পাষাণের গায় মারিব আজি এ বক্ষ ঠুকে।
শিমুলতলীর এই গ্রাম ভাই, ছোট ছোট কুঁড়ে ঘরের তলে
সুখ দুঃখের কত শত দিন আসিয়াছে আর গিয়াছে চ'লে।
গাছেরা ইহার দোলায়েছে ছায়া, বাতাস করেছে মায়ের মত,
মাটি দেছে এর-সোনার ফসল লাঙলের ঘায়ে হইয়া ক্ষত।
বাপ ভাইদের কবর খুড়িয়া শোয়ায়েছি এর মাটির তলে,
ভিজায়েছি এর শুষ্ক ধূলিরে কত বিষাদের নয়ন-জলে।

কবরে কবরে ভরিয়ে রেখেছি মমতায় জোড়া কত না দিল্,
এ গাঁয়ের প্রতি ধূলিকণা সাথে আমাদের আছে মনের মিল।
আজ যদি মোরা চোরের মতন পলাইয়া যাই এ-গাঁও ছেড়ে,
বাপ পিতামহ অভিশাপ দিবে উঠিয়া আসিয়া কবর ফেড়ে।
ভাইরা, আমরা দিনে পাঁচবার এই মস্‌জিদে নমাজ পড়ি'
খোদা রসুলের পথ পাইয়াছি কোরান শরীফ সামনে ধরি।
এই মস্‌জিদ কারে দিয়ে যাবে ? ফজর মেহেদী মাথার আগে
মোয়াজ্জিনের আহ্বান-ধ্বনি উঠিবে না আর মোহন রাগে।
তোমাদের যত আপন জনের কবরে রচিয়া ফুলের ঝাড়,
দল বেঁধে ভাই জেয়ারৎ করি ভেস্ত লইতে মাগি সবার।
আজকে তাদের হেথায় ফেলিয়া পলাইয়া যাবে চোরের মত ?
'রোজ-হাসরের' ময়দানে এর জানো দেনদারী হইবে কত।
বল ভাই সব এ-গাঁয়ের চেয়ে পবিত্র ঠাঁই কোথায় হবে ?
হেথা যদি মরি এই মক্কায় আমাদের সব কবর রবে।
এ গাঁও ছাড়িয়া যাব না যাব না, রক্ষা করিতে ইহার মাটি
প্রাণ যদি যায় সে প্রাণ হইবে বাঁচার চাইতে অনেক খাঁটি।"

এমন সময় মুন্সী সাহেব ধীর মন্থর করুণ স্বরে
কহিল, "ভাইরা, কথাটা আমার দেখিও একটু বিচার ক'রে।
জানি আমি ভাই তোমাদের এই তরুণ বুকের শুনিয়া গান
বৃদ্ধ হয়েছি, আমারো বুকের রক্ত-সাগরে ডাকে তুফান
তবু জেনো ভাই, খোদার ছুনিয়া, এখানে মোদের বাঁচিতে হবে,
সহিতে হইবে তুঃখ সুখের দোলা এসে লাগে বক্ষে যবে।
রামনগরের নায়েব মশায় খেপিয়ে দিয়েছে নমুর দলে,
মূর্খ তাহারা, এখনো শেখে নি সুজন কুজন কাহারে বলে।

খবর তোমরা অনেকেই জান, নমুরা সকলে মিলিয়া আজ,
বাঙড়ের চকে বর্শা বানায়ে আক্রমণের করিছে সাজ।
তিন গেরামের মিলিয়াছে নমু, সামান্য মোরা ক'জন লোক,
ডাক ছেড়ে যবে দাঁড়াবে আসিয়া অসাধ্য হবে ফিরাতে রোখ।
আমরা ক'জন মরিতে পারিব জানি আমি ইহা সত্য ক'রে
অসহায় যত কচি শিশুদের দিয়ে যাবে ভাই কাদের করে?
এই মস্‌জিদ ইটের গাঁথনি, আল্লা হেথায় করে না বাস,
ইহার মায়ায় মাথায় করিয়া বহিয়া আনিবে সর্ব্বনাশ?
মুসলমানের যেথায় বসতি সেথা ম'সজিদ আপনি হবে,
মানুষ মরিলে ম'সজিদে বসি আল্লার নাম কাহারা লবে?
বল বল ভাই ক'খানা ইটের স্তম্ভের আজ রাখিতে মান,
কেন এ মৃত্যু-কবলে ঝাঁপায়ে পড়িবে তোমরা মুসলমান?
কথা শুন ভাই, কাজীর গাঁয়েতে আমরা সকলে পালায়ে যাই,
সেথায় মোদের আশ্রয় দিবে মুসলমানেরা জাতের ভাই।
সেখানে আমরা দলে বেশী হ'ব দরকার হ'লে সুযোগ বুঝে
আজের দিনের যত প্রতিশোধ লইব তাদের সামনে যুঝে।"

মুন্সী সা'বের কথাগুলো যেন মাখনের মত সবার মনে—
বড় সুকোমল আঁকিল পেলব মায়া ও মমতা স্নেহের সনে।
একে একে গাঁর সকলেই দিল মুন্সী সা'বের কথায় সায়,
আজকের রাতে পালাইয়া তারা চ'লে যাবে দূর কাজীর গাঁয়।
আকাশের পানে দু'হাত তুলিয়া মুন্সী সাহেব কহিল, "ভাই—
এসো আজ মোরা যাইবার কালে শেষ মোনাজাত করিয়া যাই।
ইয়ে খোদা তুমি গফুরে রহিম, সকল দুনিয়া দেখিছ বসি,'
নেকী-বদী কাম যত জীবনের লিখিয়া রাখিছ অঙ্ক কষি।

তুমি যাহা কর ভালর তরেই, আজিকার এই দুখের রাতে
হে বন্ধু যেন দেখা পাই তব আমাদের যত ব্যথার সাথে।
শিমুলতলীর যত তরুলতা, তোমাদের মোরা ছাড়িয়া যাই,
আজি শেষ দিনে ফুলের মতন ফলের মতন আশিস্ চাই।
শিমুলতলীর শস্যের মাঠ, ধান্য গোধূমে আঁচল ভরি,
পালিয়াছ এই সন্তানগণে মায়ের মতন যতন করি ;
মায়া মমতায় জড়ায়ে রয়েছ ভরিয়া শিমুলতলীর মাঠ—
যত দূরে যাই এই কথা মোরা স্মৃতির ফলকে করিব পাঠ।
দারুণ দুখের দহনে দহিয়া দিনে দিনে মোরা সকল ভাই
রক্তে রক্তে লিখিয়া রাখিব ; শিমুলতলীরে ফিরায়ে চাই।
জীবনের প্রতি কর্ম্মের মাঝে চিন্তা আর ঘুমের ঘোরে—
আমাদের যত অণু পরমাণু কাঁদিবে শিমুলতলীর তরে।
শিমুলতলীর কবরে কবরে যাহারা আজিকে ঘুমায়ে রও,
তোমাদের যত বংশধরের আজিকের শেষ সালাম লও।

এই কথা ব'লে মুন্সী সাহেব মস্‌জেদ হতে উঠিয়া ধীরে
গোরস্থানের নিকটে দাঁড়াল, বক্ষ ভাসিছে নয়ন নীরে।
তারি সাথে সাথে দাঁড়াল আসিয়া শিমুলতলীর গাঁয়ের লোক,
সবার নয়ন হইতে ঝরিছে বাঁধ-হারা এক ব্যথার শোক।
কবরের পাশে হাঁটু গাড়া দিয়ে আকাশের পানে তুলিয়া হাত
গদগদ ভাসে মুন্সী সাহেব কহে, "খোদা তুমি দীনের নাথ।
পূর্ব্বপুরুষ ঘুমায়ে রহিল কবরে হেথায় বাঁধিয়া ঘর,
তোমার আশিস্ ঝরে যেন সদা দিবস রজনী তাদের 'পর।
হে মৃতেরা শোন, তোমাদের তরে শেষ জেয়ারত করিয়া যাই,
শিমুলতলীর গোরস্থানেতে মিলিব না আর সকল ভাই।

শবেবরাতের রজনীতে হেথা জ্বালিবে না আর মোমের বাতি,
ব্যথিত জনের লোবানের বাসে উঠিবে না আর বাতাস মাতি।
যে খোদা দেখিছে সকল দুনিয়া, সে যেন মোদের বাসনা লয়ে,
কবরে কবরে পড়ে জেয়ারত ঈদের বাসরে মোদের হয়ে' ।"

এই কথা বলি মুন্সী সাহেব কোরান শরীফ খুলিয়া ধরি'
কি এক করুণ আয়াত পড়িল দুইটি নয়ন জলেতে ভরি।
তার পর শেষে অতি ধীরে ধীরে সামনের পানে চরণ ফেলি—
সুদূর গাঁয়ের মাঠেতে চলিল কুহেলি রাতের আঁধার ঠেলি'।
কণ্ঠে তখনো কোরানের সুর, সারে জাহানের বেদনা ব'য়ে
দিকে দিগন্তে ছড়ায়ে পড়িছে ঘন নিশীথের আঁধারালয়ে।
তারি পিছে পিছে শিমুলতলীর সকল মানুষ চ'লেছে কাঁদি,
পৃথিবীর যত অন্যায় আর বেদনার যেন হইয়া বাদী।
দু' ধারে আঁধার—ঘন আঁধিয়ার, ক্রন্দন যেন জড়ায়ে তায়,
রাতের উতল পবনে মথিয়া দূরবন-পথে ঘূরছে হায়।



৮

পিরীত ভাঙলে বিচ্ছেদের আগুন নেভে না।

—কবিগানের ধুঁয়া

নমুরা ওদিকে বাঙড়ের চকে লইয়া নানান তর্ক জাল—
ধন্নুক বাঁকায়ে বর্শা ঘুরায়ে কাটাল সারাটি রজনী কাল।
বহুদিন তারা কাইজা করে না, মরিচা ধরেছে অস্ত্রে আজ,
বাঁশের লাঠিতে ঘুণ ধরিয়াছে, ইঁদুরে খেয়েছে যুদ্ধ সাজ।
যুবকেরা যত কাইজার নামে মহা উল্লাসে উঠেছে মাতি,
হাত পা'ও যেন উস্‌খুস্‌ করে, লাফাইয়া উঠে বুকের ছাতি।
হাতে হাত ঘষে, বুকে বুক ঠুকে, ঘুরায়ে বর্শা লাফায়ে পড়ে,
কাঁশার থালার বাজনা বাজায়, ডাক ছাড়ে কভু বিকট স্বরে।
ন্যায়ের তাহারা ধারে না ক ধার, সরকী ও লাঠি পেয়েছে হাতে,
আজকে তাহারা দেখাইয়া দিবে ধরায় কি কাজ হয় বা তাতে।
হাতে রাম-দাও, তীর বল্লম, চরণের তলে নাচে যে মাটি,
উল্লাস-ভরা চীৎকারে আজ আকাশ জমীন যাইবে ফাটি'।

দূরে এক পাশে বুড়োরা বসিয়া, বদনে কালিমা চিন্তা-ভার,
মীমাংসা তারা করিতে পারে না কি যেন বিরাট সমস্যার।
বহুক্ষণ পরে নিতাই কহিল, "ভাবিয়া এখন হবে না কিছু,
সামনের পানে চলিতেই হবে, পথ যদি নাই হটিতে পিছু।"
গদাই মোড়ল কহিল উঠিয়া, "তোমার কথায় দিলাম সায়,
সামনে যে তবু এগোতে পারি নে, মন যে আমার মানে না হায়।

আজকে যাদের মারিতে চলিনু, তারা যে আমার আপন ভাই,
তোমাদের আমি পায়ে পড়ি, বল একথা কেমনে ভুলিয়া যাই ?
যাহাদের ঘর ভাঙিতে চলিনু, কাল যে তাদের ছেয়েছি ঘর,
আগুন লাগিলে সকলে মিলিয়া জল ঢালিয়াছি মাথার পর।"
"মেড়ল তোমার সব কথা বুঝি," নিতাই কহিল ধরিয়া হাত,
"মনে রেখো আজ রক্ষাকালীর আদেশ এনেছি মোদের সাথ।
সেই সনে দোলে নায়েব মশা'র রক্তবরণ লোচন দু'টি,
সামনের পানে এগোতেই হ'বে, নিস্তার নাহি পেছনে ছুটি'।"
"তবে তাই হোক্," গদাই ডাকিল, "এসো এসো গাঁর সকল ভাই।
সামনের পানে এগিয়েই চলি পিছনের যদি শকতি নাই।"

উল্লাস ভরে নাচে নমু দল মশালের পর মশাল জ্বালি,
খড়্গ ঘুরায়ে সড়কী ঘুরায়ে ডাক ছেড়ে চলে হাজার ঢালী।
চলে তারা চলে বাঙড়ের পথে, চরণে মথিত মেদিনী মাটি,
হাতে উলঙ্গ আগুন নাচিছে, কালো মশালের ধরিয়া ডাঁটি।
রহিয়া রহিয়া গরজিয়া ওঠে, তরঙ্গ তার ধরণী ঘুরি—
গগনে গগনে জাগাইছে ত্রাস বিদ্যুদ্দাম মেঘেতে ছুঁড়ি।
আজকে তাহারা হাতে পাইয়াছে পিনাক-পাণির ত্রিশূল খান,
সুরাসুর নর যে আসিবে পথে, আজকে কাহারো নাহিক ত্রাণ।

পিছন হইতে মোড়ল ডাকিল, "ফিরিয়া দাঁড়াও সকল ভাই,
কি কাজ মারিয়া মুসলমানেরে, চল মোরা ঘরে চলিয়া যাই।"
"ফিরব না মোরা, ফিরব না আর," হাজার নমুর উঠিল রোল—
মহামরণের দোলনায় তারা জীবনেরে লয়ে খেলিবে দোল।
আজকে তাহারা হাতে পাইয়াছে রাম খাঁড়া আর বর্শা তীর,
বাহুতে নাচিছে নব-জীবনের রক্ত-রঙিন ফেনিল নীর।

সমুখের ডাক কে শুনাবে এসো, কাইজার থালা বাজাও ভাই,
পিছন সে তারে পথের ধুলায় চরণে চরণে পিষিয়া যাই।
চলে তা'রা চলে বাওড়ের মাঠে গাজনপুরের ম'জিদ্ ছাড়ি,
শ্মশানের ঘাট পেরিয়েই দেবে শিমুলতলার হালটে পাড়ী।

"ফিরিয়া দাঁড়াও।" গোদাই মোড়ল ঘোষিল উচ্চে সামনে আসি,
"নতুবা আমার বুকের রক্তে মেটাও এ ক্ষুধা সর্ব্বগ্রাসী।"
থমকি দাঁড়াল হাজার লেঠেল, সামনে দাঁড়ায়ে গদাই কয়,
"কারে সাথে ক'রে চ'লেছ ভাইরা, কোন্ সে মহল করিতে জয়?
সোজনের কথা মনে পড়ে আজ? নমুর মধ্যে মুসলমান
যখন দাঁড়াত, ভূত প্রেত দানা ভয়ে ছিল সদা কম্পমান।
বিল নাইলার্ কাইজার দিনে ভাট গেঁয়োদের হাজার শির,
কাহার লাঠিতে আধখানা হয়ে লুটেছিল বুকে এ পৃথিবীর?
নমুর হইয়া কে দাঁড়াত আগে? রামনগরের নায়েববাবু—
কার হুঙ্কারে ছিল এই গাঁয়ে ভেজা বেড়ালের মত কাবু?
কে শিখাল হাতে ধরিবারে লাঠি? মহা উল্লাসে আজিকে ফিরে
দল জুটে সব ছুটে চলিয়াছ সেই লাঠি তার হানিতে শিরে।
কার কথা শুনে ছুটিয়াছ ভাই? রামনগরের নায়েব মশায়,
গায়েতে নমুর ছোঁয়া লাগে বলে দশ হাত দূরে সরিয়া যায়।
চাঁড়াল বলিয়া গাল দেয় যারা, পদধূলি দিয়ে করুণা করে,
মুসলমানেরে গাঁও-ছাড়া করি তাড়াইয়া দিব তাদের তরে?
আমাদের সাথে চৈত্রের রোদে ঘামিয়া যাহারা লাঙল ঠেলে,
ঝড় বাদলেতে বিপদে আপদে যখন তখন ডাকিলে মেলে।"

এমন সময় নিতাই কহিল, "রক্ষাকালীর আদেশ নিয়ে,
পালন না করে ঘরে ফিরে যাব, ভয়েতে যে মোর কাঁপিছে হিয়ে।"
"রক্ষাকালীর আদেশ পেয়েছি? যার মন্দিরে শিয়াল রয়,
বিড়াল কুকুর যেথা ঘোরে ফিরে, নমু গেলে সেথা ঘটে প্রলয়।
রক্ষাকালীর আদেশ এনেছি, স্বরূপ তাহার বুঝেছি আজ,
যত গরীবের রক্ত চুষিয়া যাহার পূজায় হইছে সাজ।
মন্দির তার গড়িয়া দিয়াছে আমাদের যারা চাঁড়াল বলে,
গরীবের ভোগ লুণ্ঠন করি দু'বেলা যাহার আহার চলে।
আদেশ তাহার আমরা পাই নি, শুনিবারে শুধু নায়েব পায়,
ভিটে বাড়ী ঘর নিলামে উঠেছে যাহার দু'খান চরণ-ঘায়।
ধিক্কার আজি, ধিক্কার মোরে, তাহারি পূজার ফুলের হার
মাথায় পরিতে ধরণীর তলে লুটায়ে পড়ে নি আজি এ ঘাড়।
যার শিরে আজি যত মালা আছে ছিঁড়ে ছিঁড়ে এসো টুকরো করি
পথের ধূলায় দলিয়া পিষিয়া এ অপমানের পূরণ করি।"

এই কথা বলি থামিল গদাই, অঙ্গ যে কাঁপে রাগের ভারে,
চোখে মুখে যেন সেই এক ভাব, কেউ দেখে নাই এমন তারে।
নমুরা সকলে যার গলে যত আছিল পূজার ফুলের হার,
ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া চরণের তলে ধূলায় দলিয়া করিল সার।
পূর্ব্ব তোরণে হাসে এলোকেশী বদন হইতে রুধির ঝরে,
চরণ মথিত নিশীথ-আঁধার ধরি দিগন্ত রোদন করে।

৯

উইড়া যায় রে হংসরে পাখি পইড়া রয় রে ছায়া
দেশের মানুষ দেশে যাইব কে করিব মায়া।
—মুর্শীদা গান

নমুর পাড়ায় প্রভাত হইল, তারকাব্রতের
আলাপনা—আঁকা রঙিন অঙন-খানি,
—আসিল উষসী হাসিয়া হাসিয়া তাহারি উপরে
আলতা ছোপান পায়ের আঁখর টানি।
গলায় গলায় জল-থইথই ধল-দীঘি, তার
চারি ধার দিয়ে ছোট বড় নানা ঘাট—
মুখর করিয়া কুমারী মেয়েরা মাঘ-মণ্ডল
ব্রতের শোলক নীরবে করিছে পাঠ।

ইতল বেতস সরুয়া মরুয়া ফুল-কন্যারা
কোথা কোন দেশে নল ভেঙে জল খায়,
—সে ফুলের বাসে পুকুরের জল ঢেউ খেলে দেখে'
ফুলের মালিনী হেসে ঢ'লে পড়ে যায়।
আধেক নদীতে ঝড়ি ও বৃষ্টি আধেক নদীতে
বসিয়া রয়েছে মালীর বউটি একা,
মধ্য খানেতে রঙে রঙ মেলি জৈত ফুলের
ডালিখানি প'ড়ে নিমিষে যাইবে দেখা।

বাগান ভরিয়া ফুল ফুটিয়াছে, ডাল লোটায়েছে
নানা বরনের কোমল ফুলের ভারে ;
আগের যে ফুল কলি কলি, আর মালী বউ যেন
ছিঁড়িয়া লয় না, বারণ করিও তারে।

এমনি করিয়া শিশু কণ্ঠের ছড়ায় ছড়ায়
মুখর হইল দীঘির চারিটি পাড়,
গাঁয়ের বধূরা এখানে সেখানে জটলা করিয়া
একথা সেকথা কহিতেছে বার বার।
উঠানের ধারে হ্যাচড়া পূজার বেদীতে জমেছে
বন-দূর্ব্বা ও বনফুল এক বোঝা,
চারিধার ঘিরি ছেলেরা মেয়েরা শোলক পড়িছে,
কখনো বেঁকিয়ে কখনো হইয়ে সোজা।

আম কাটালের পিঁড়িখানি ভরি সরু সরু করে
লতা ফুল আঁকা, ঘি মউ মউ করে,
তাহারি উপরে বাপ ভাই মিলি ঢোল বাজাইয়া
বামুন ডাকিয়া কন্যারে দান করে।

নানান ব্রতের নানান ছড়ায় শিশু কাকলীতে
ভরিয়া গিয়াছে সবগুলি নমু বাড়ী,
এমন সময় খবর আসিল, মুসলমানেরা
গ্রাম হ'তে আজ হঠাৎ গিয়াছে ছাড়ি।

ব্রতীর হাতের ফুল পড়ে গেল, পুকুরের পাড়ে
আধখানি ভরা কাখের কলসী রাখি'
গাঁয়ের মেয়েরা গাঁয়ের বধূরা ছুটিয়া চলিল
অঞ্চল দিয়া মুছিতে মুছিতে আঁখি।

ঘর বাড়ী সব পড়িয়া রয়েছে, ঘরের মানুষ
পলাইয়া গেছে না জানি কিসের তরে,
পীরের দরগা শূন্য আজিকে, বিড়াল কুকুর
ফিরিতেছে সেথা আপন ইচ্ছা ভরে।
মস্‌জিদে সবে আজান হাঁকিয়া মুসলমানেরা
প্রভাত না হ'তে নামাজে হইত খাড়া ;
সেখানে আজিকে গোটা দুই ষাঁড় মাটি খুঁড়িতেছে—
আপনার মনে শিঙে শিঙে দিয়ে ঝাড়া।

হলুদের পাটা পড়িয়া রয়েছে, আধেক হল্‌দী
বাটিয়া কোথায় বাটুনী গিয়াছে চলি,
কালকের তোলা মেহেদীর পাতা সাজীতে রয়েছে,
ছেঁচিয়া কেহই লয়নি চরণে ডলি।
সিঁদুর কৌটা লুটায় মাটিতে, সকিনার সেই
বিবাহের জাত্‌ ধুলায় পড়িয়া আছে ;
মদীনা সখীর খোপ কবুতর এ-ডালে ও-ডালে
ডাকিয়া ডাকিয়া কাঁদিছে শিমুল গাছে।
ময়নামতীর উঠান ঘিরিয়া লহর খেলিছে পূবাল বাতাসে
হেলিয়া দুলিয়া লাল নৈটার শাখ,
মুন্সীবাড়ীর মৌলবী কচু পাতায় মেলিয়া
রঙিন আঁখর কাহারে পাড়িছে ডাক।

এ-বাড়ী হইতে ও-বাড়ীতে যায়, সহজ-সরল
নমু-মেয়েদের চোখ ভরে আসে জলে ;
কিছুতেই তারা ভাবিয়া না পায়, মুসলমানেরা
গ্রাম ছেড়ে গেল আজিকে কিসের ছলে।

দুলালীর যেন কি হয়েছে আজ, বিনা কারণেতে
যখন তখন জোর করে হেসে ওঠে,
কি দুঃখ ওর বুকের গহনে, প্রকাশ তাহার
চেষ্টা করেও ফিরাইতে নারে মোটে।

*   *   *   *

দিনের পরেতে দিন চ'লে গেল, ঘটনার পর
ঘটনা আসিয়া অতীতেরে দিল ঢাকি ;
নমুর পাড়ায় একটি মেয়ের অন্তর কেন
বিনা কারণেতে কেঁদে উঠে থাকি থাকি।
হায় পলাতক, যাবার বেলায় কারে কহ নাই ;
শেষের কথাটি দু'ফোঁটা আঁখির জলে,
তোমারে ছাড়িয়া কাহারো দিবস কাটিতে চাবে না,
এ কথা কি কেহ দেয় নাই তোমা ব'লে ?

আজকে দুলীর হৃদয় ভরিয়া অতীতের যত
ভোলা দিন গুলো আসে যায় আর যায়,
কতনা সুখের রঙিন স্বপন গড়িয়া গড়িয়া
ভাঙিয়া পড়িছে স্মৃতির দোদুল বায়।
সে সব দিবস কবে চ'লে গেছে, যাবার বেলায়
রেখে যায় নাই এতটুকু যারা চিন্,
আজকে তাহারা কোথা হ'তে আসি শয়নে স্বপনে
দুলীর পরানে বাজায় ব্যথার বীণ্।

সেই কবেকার আম পাড়া নিয়ে সোজনের সাথে
মিছি মিছি দুলী কলহ করিয়া হায়,
বলেছিল, "দেখ্ তোর সাথে আমি কহিবনা কথা,
কখনো ক'ব না যদিবা পরান যায়।"
সোজন তখন বাঘার ভিটায় তেঁতুল গাছের
সব চেয়ে উঁচু খুব সরু ডালে উঠি—
বলেছিল তারে, "কথা না কহিলে এক্ষুনি সে যে
লাফায়ে পড়িবে সেইখান থেকে ছুটি।"
দুলীর শপথ তখনি ভাঙিল, তারপর শেষে
তেঁতুল তলায় দুজনে বসিয়া ছায়—
কিশোর মনের কল্পনা নিয়ে পাখীর মতন
রঙিন পাখায় উড়েছিল নভ-গায়।
আজ সে সোজন দুলীরে ছাড়িয়া কোন্ প্রাণ লয়ে
কিসের মায়ায় রহিয়াছে হায় দূরে ?
যাবার বেলায় কোন কথা তার বলিতে ছিলনা—
হতভাগী এই চিরদুখী ব্যথাতুরে ?

আজ মনে পড়ে সেই রায় দীঘি, দুজনে বসিয়া
বউ কথা কও পাখীদের মত ডাকা ;
তারপর সেই মায়ের নিকটে মার খেয়ে পিঠ
ফুলিয়া ফুলিয়া হয়েছিল চাকা চাকা।
এসব সোজন কেমনে ভুলিল, তার তরে দুলী
কত লাঞ্ছনা পেয়েছে মায়ের কাছে ;
পাড়া-পড়শীরা রটায়েছে যাহা, মারের চাইতে
কতনা কঠিন লাগিয়াছে তার কাছে।

আজকে দুলীর বুক ভরা ব্যথা, কহিয়া জুড়াবে
এমন দোসর কেহ নাই হায় তার,—
শুধু নিশাকালে, গহন কাননে, থাকিয়া থাকিয়া
কার বাঁশী যেন বেজে মরে বার বার।

কে বাঁশী বাজায়, কোন্ দূর পথে গভীর রাতের
গোপন বেদনা ছুঁড়িয়া উদাস সুরে,
দুলীর বুকের কান্দনখানি সে কি জানিয়াছে,
তাহার বুকেরে দেখেছে সে বুকে পুরে ?

১০

মনের মতন মানুষ নাই যেদেশে
সেদেশে কেমনে থাকি ।

নমুর পাড়ায় বিবাহের গানে আকাশ বাতাস
উঠিয়াছে আজি ভরি ;
থাকিয়া থাকিয়া হইতেছে উলু ; ঢোল ও সানাই
বাজিতেছে গলা ধরি ।
রামের আজিকে বিবাহ হইবে, রামের মায়ের
নাহি অবসর মোটে ;
সোনার বরন সীতারে বরিতে কোন খানে আজ
দূর্ব্বা ত' নাহি জোটে ।
কোথায় রহিল সোনার ময়ূর, গগনের পথে
যাওরে উড়াল্ দিয়া,
মালঞ্চ-ঘেরা মালিনীর বাগ হইতে গো তুমি
দূর্ব্বা যে আনো গিয়া ।

এমনি করিয়া গেঁয়ো মেয়েদের করুণ সুরের
গানের লহরী পরে
কত সীতা আর রাম লক্ষ্মণ বিবাহ করিল
দূর অতীতের ঘরে ।
কেউ বা সাজায় বিয়ের কনেরে, কেউ রাঁধে বাড়ে
ব্যস্ত হইয়া বড় ;
গদাই নমুর বাড়ী খানি যেন ছেলেমেয়েদের
কলরবে নড় নড় ।

দূরে গাঁ-র পাশে বনের কিনারে দুজন কাহারা
ফিস্ ফিস্ কথা কয়।—
বিবাহ বাড়ীর এত সমারোহ সেদিকে কাহারো
ভ্রূক্ষেপ নাহি হয়।

"সোজন, আমার বিবাহ আজিকে, এই দেখ আমি
হলুদে করিয়া স্নান—
লাল চেলী আর শাঁখা সিন্দূর, আলতার রাগে
সাজায়েছি দেহখান্।
তোমারে আজিকে ডাকিয়াছি কেন, নিকটে আসিয়া
শুন তবে কান পাতি,
এই সাজে আজ বাহির হইব যেথা যায় আঁখি,
তুমি হবে মোর সাথী।"

"কি কথা শুনালে অবুঝ, এখনো ভাল ও মন্দ
বুঝিতে পারনি হায়,
কাঞ্চাবাঁশের কঞ্চিরে আজি যেদিকে বাঁকাও,
সেদিকে বাঁকিয়া যায়।"
"আমি ত না জানি, শিশুকাল হ'তে তোমারে ছাড়িয়া,
—বুঝি নাই আর কারে,
আমরা জীবনে এক সাথে র'ব, এই কথা তুমি
বলিয়াছ বারে বারে।—
এক বোঁটে মোরা দু'টি ফুল ছিনু, একটিরে তার
ছিঁড়ে নেয় আর জনে ;
সে ফুলেরে তুমি কাড়িয়া লবেনা ? কোন কথা আজ
কহেনা তোমার মনে ?

ভাবিবার আর অবসর নাহি, বনের আঁধারে
মিশিয়াছে পথ খানি,
দু'টি হাত ধরে সেই পথে আজ, যত জোরে পার
মোরে নিয়ে চল টানি।
এখনি আমারে খুঁজিতে বাহির হইবে ক্ষিপ্ত
যত না নমুর পাল,
তার আগে মোরা বন ছাড়াইয়া পার হয়ে যাব
কুমার নদীর খাল।
সেথা আছে ঘোর অতসীর বন, পাতায় পাতায়
ঢাকা তার পথ গুলি,
তারি মাঝ দিয়া চ'লে যাব মোরা, সাধ্য কাহার
সে পথের দেখে ধূলি।"

"হায় দুলী তুমি এখনো অবুঝ, বুদ্ধি স্বুদ্ধি
কখন বা হবে হায়।
এ পথের কিবা পরিণাম তুমি ভাবিয়া আজিকে
দেখিয়াছ কভু তায় ?
আজ হোক্ কিবা কাল হোক্ মোরা ধরা পড়ে যাব
যে কোন অশুভ ক্ষণে,
তখন মোদের কি হবে উপায়, এই সব তুমি
ভেবে কি দেখেছ মনে ?
তোমারে লইয়া উধাও হইব, তার পর যবে
ক্ষিপ্ত নমুর দল—
মোর গাঁয়ে যেয়ে লাফায়ে পড়িবে দাদ নিতে এর,
লইয়া পশুর বল ?

তখন তাদের কি হবে উপায় ?   অসহায় তারা।
—না না, তুমি ফিরে যাও।
যদি ভালবাস, লক্ষ্মী মেয়েটি, মোর কথা রাখ,
নয় মোর মাথা খাও।"

"নিজেরি স্বার্থ দেখিলে সোজন, তোমার গেরামে
ভাই বন্ধুরা আছে,
তাদের কি হবে—তোমার কি হবে ? মোর কথা তুমি—
ভেবে না দেখিলে পাছে ?
এই ছিল মনে, তবে কেন মোর শিশুকালখানি
তোমার কাহিনী দিয়ে—
এমন করিয়া জড়াইয়া ছিলে ঘটনার পর
ঘটনারে উলটিয়ে ?
আমার জীবনে তোমারে ছাড়িয়া কিছু ভাবিবারে
অবসর জুটে নাই,
আজ কে তোমারে জনমের মত ছাড়িয়া হেথায়
কি করে যে আমি যাই !
তোমার তরুতে আমি ছিনু লতা, শাখা দোলাইয়া
বাতাস করেছ যারে,
আজি কোন্ প্রাণে বিগানার দেশে, বিগানার হাতে
বনবাস দিবে তারে ?
শিশুকাল হ'তে যত কথা তুমি সন্ধ্যা সকালে
শুনায়েছ মোর কানে,
তারা ফুল হয়ে তারা ফল হয়ে পরান-লতারে
জড়ায়েছে তোমাপানে।

আজি সে কথারে কি করিয়া ভুলি' সোজন, সোজন !
　　　—মানুষ পাষাণ নয় !
পাষাণ হইলে আঘাতে ফাটিয়া চৌচির হ'ত,
　　　পরান কি তাহা হয় ?
ছাঁচিপান দিয়ে ঠোঁটেরে রাঙালে, তখনি তা মোছে
　　　ঠোঁটেরি হাসির ঘায়,
কথার লেখা যে মেহেদীর দাগ—যত মুছি তাহা
　　　তত ভাল পড়া যায়।
নিজের স্বার্থ দেখিলে আজিকে, বুঝিলে না এই
　　　অসহায় বালিকার
দীর্ঘজীবন কি করে কাটিবে তাহারি সঙ্গে,
　　　কিছু নাহি জানি যার।
মন সে ত নহে কুমড়ার ফালি, যাহারে তাহারে
　　　কাটিয়া বিলান যায়,
তোমারে যা দেছি, অপরে তা যবে জোর করে চাবে'
　　　কি হবে উপায়, হায় !"

"জানি আমি জানি, আমারে ছাড়িতে তোমার মনেতে
　　　জাগিবে শতেক ব্যথা,
তবু সে ব্যথারে সহিও গো তুমি, শেষ এ মিনতি,—
　　　করিও না অন্যথা।
আমার মনেতে আশ্বাস র'বে, একদিন তুমি
　　　ভুলিতে পারিবে মোরে,
সেই দিন যেন দূরে নাহি রয়, এ-আশিস্ আমি
　　　করে যাই বুক ভরে'।

এইখানে মোরা দুই জনে মিলি' গাড়িয়াছিলাম
বট পাকুড়ের চারা,
নতুন পাতার লহর মেলিয়া, এ ওরে ধরিয়া
বাতাসে দুলিছে তারা!
সরু ঘট ভরি জল এনে মোরা প্রতি সন্ধ্যায়
ঢালিয়া এদের গোড়ে,
আমাদের ভালবাসারে আমরা দেখিতে পেতাম
ইহাদের শাখা পরে।
সামনে দাঁড়ায়ে মাগিতাম বর, এদেরি মতন
যেন এ জীবন দু'টি,
শাখায় জড়ায়ে, পাতায় জড়ায়ে, এ ওরে লইয়া
সামনেতে যায় ছুটি।
এ গাছের আর কোন্ প্রয়োজন ? এসো দুই জনে
ফেলে যাই উপাড়িয়া,
নতুবা ইহারা আর কোনো দিনে এই সব কথা
দিবে মনে ফিরাইয়া।

ওইখানে মোরা কদমের ডাল টানিয়া বাঁধিয়া
আম্র শাখার সনে,
দুই জনে বসি ঠিক করিতাম, কেবা হবে বর,
কেবা হবে তার কনে।
আম্র শাখার মুকুল হইলে, কদম গাছেরে
করিয়া তাহার বর
মহাসমারোহে বিবাহ দিতাম মোরা দুই জনে
সারাটি দিবস ভর।

আবার যখন মেঘলার দিনে কদম্ব শাখা
হাসতে ফুলের ভারে,
কত গান গেয়ে বিবাহ দিতাম আমের গাছের
নববধূ করি তারে।
বরণের ডালা মাথায় করিয়া, বন-পথে ঘুরে—
মিহি স্থরে গান গেয়ে,
তুমি যেতে যবে তাহাদের কাছে, আঁচল তোমার
লুটাত জমিন ছেয়ে।
দুই জনে মিলে কহিতাম, যদি মোদের জীবন
দুই দিকে যেতে চায়,
বাহুর বাঁধনে বাঁধিয়া রাখিব, যেমনি আমরা
বেঁধেছি এ দু'জনায়।
আজিকে দুলালী, বাহুর বাঁধন হইল যদিবা
স্বেচ্ছায় খুলে দিতে,
এদেরো বাঁধন খুলে দেই, যেন এই সব কথা
কভু নাহি আনে চিতে।"

"সোজন সোজন, তার আগে তুমি, যে লতার বাঁধ
ছিঁড়িলে আজিকে হাসি,
এই তরুতলে, সেই লতা দিয়ে আমারো গলায়
পরাইয়ে যাও ফাঁসি।
কালকে যখন আমার খবর শুধাবে সবারে—
হতভাগা বাপ-মায়,
কহিও তাদের, গহন বনের নিদারুণ বাঘে
ধরিয়া খেয়েছে তায়।

যেই হাতে তুমি উপাড়ি ফেলিলে শিশু বয়সের
বট-পাকুড়ের চারা,
সেই হাতে এসো ছুরি দিয়ে তুমি আমারো গলায়
ছুটাও লহুর ধারা।
কালকে যখন গাঁয়ের লোকেরা, হতভাগিনীর
পুছিবে খবর এসে,
কহিও, দারুণ সাপের কামড়ে মরিয়াছে সে যে,
গভীর বনের দেশে।
কহিও, অভাগী ঝালী না বিষের লাড়ু বানাইয়া —
খাইয়াছে নিজ হাতে ;
আপনার ভরা ডুবায়েছে সে যে অথই গভীর
কূলহীন দরিয়াতে।"

"ছোট বয়সের সেই দুলী তুমি, এত কথা আজ
শিখিয়াছ বলিবারে,
হায় আমি কেন সায়রে ভাসাম্ন দেবতার ফুল, —
সরলা এ বালিকারে।
আমি জানিতাম, তোমার লাগিয়া তুঁষের অনলে
দহিবে আমারি হিয়া,
এ পোড়া প্রেমের সকল যাতনা নিয়ে যাব আমি
মোর বুকে জ্বালাইয়া।
এ মোর কপাল শুধুত পোড়েনি, তোমারো আঁচলে
লেগেছে আগুন তার ;
হায় অভাগিনী, এর হাত হ'তে এ জনমে তব
নাহি আর নিস্তার।

তবু যদি পার মোরে ক্ষমা কোরো, তোমার ব্যথার
আমি একা অপরাধী ;
সব তার আমি পূরণ করিব, রোজ কেয়ামতে—
দাঁড়াইও হয়ে বাদী।
আজকে আমারে ক্ষমা করে যাও, সুদীর্ঘ এই
জীবনের পরপারে—
সুদীর্ঘ পথে বয়ে নিয়ে যেয়ো আপন বুকের—
বেবুঝ এ বেদনারে।
সেদিন দেখিবে হাসিয়া সোজন খর দোজখের
আতসের বাসখানি,
গায়ে জড়াইয়া, অগ্নির যত তীব্র দাহন
বক্ষে লইবে টানি।
আজিকে আমারে ক্ষমা করে যাও, আগে বুঝি নাই
নিজেরে বাঁধিতে হায়,
তোমার লতারে জড়ায়েছি আমি, শাখা বাহুহীন
শুকনো তরুর গায়।
কে আমারে আজ বলে দিবে তুলি, কি করিলে আমি
আপনারে সাথে নিয়ে,
এ পরিণামের সকল বেদনা নিয়ে যেতে পারি—
কারে নাহি ভাগ দিয়ে।"

"ওই শুন দূরে ওঠে কোলাহল, নমুরা সকলে
আসিছে এদিক পানে,
হয়ত এখনি আমাদের তারা দেখিতে পাইবে—
এইভাবে এইখানে।

সোজন ! সোজন !! তোমরা পুরুষ, তোমারে দেখিয়া
কেউ নাহি কিছু কবে,
ভাবিয়া দেখেছ, এইভাবে যদি তারা মোরে পায়,
কিবা পরিণাম হবে ?
তোমরা পুরুষ, সমুখে পিছনে যে দিকেই যাও,
চারিদিকে খোলা পথ ;
আমরা যে নারী, সমুখ ছাড়িয়া যে দিকেতে যাব,
বাধাঘেরা পর্ব্বত।
তুমি যাবে যাও, বারন করিতে আজিকার দিনে
সাধ্য আমার নাই,
মোরে দিয়ে গেলে কলঙ্ক ভার, মোর পথে যেন
আমি তা বহিয়া যাই।
তুমি যাবে যাও, আজিকার দিনে এই কথা গুলি
শুনে যাও শুধু কাণে,
জীবনের যত ফুল নিয়ে গেলে, কণ্টক তরু
বাড়ায়ে আমার পানে।

বিবাহের বধূ পালায়ে এসেছি, নমুরা আসিয়া
এখনি খুঁজিয়া পাবে,
তারপর তারা আমারে ঘিরিয়া অনেক কাহিনী
রটাবে নানান ভাবে।
মোর জীবনের সুদীর্ঘ দিনে, সেই সব কথা
চোর কাঁটা হয়ে হায়,
উঠিতে বসিতে পলে পলে আসি নব নব রূপে
জড়াবে সারাটি গায়।

তবু তুমি যাও, আমি নিয়ে গেনু এ পরিণামের
যত কলঙ্ক জ্বালা,
তুমি নিয়ে যাও, সে সুখ-তরুর যত ফুল আর
যত গাঁথা ফুল-মালা।
ক্ষমা কর তুমি, ক্ষমা কর মোরে, আকাশ সায়রে
তোমার চাঁদের গায়,
আমি এসেছিনু, মোর জীবনের যত কলঙ্ক
মাখাইয়া দিতে হায়।
সে পাপের যত শাস্তিরে আমি আপনার হাতে
নীরবে বহিয়া যাই,
আজ হ'তে তুমি মনেতে ভাবিও, দুলী বলে পথে
কারে কভু দেখ নাই।

সোতের সেওলা, ভেসে চলে যাই, দেখা হয়েছিল
তোমার নদীর কূলে,
জীবনেতে আছে বহু সুখ হাসি, তার মাঝে তুমি—
সে কথা যাইও ভুলে।
যাইবার কালে জনমের মত শেষ পদধূলি
লয়ে যাই তবে শিরে,
আশিস করিও, সেই ধূলি যেন শত ব্যথা মাঝে
রহে অভাগীরে ঘিরে।
সাক্ষী থাকিও দেব ধর্ম্ম, সাক্ষী থাকিও—
হে বনের গাছপালা।
সোজন আমার প্রাণের সোয়ামী, সোজন আমার
গলার ফুলের মালা।

সাক্ষী থাকিও চন্দ্র সূর্য্য, সাক্ষী থাকিও—
আকাশের যত তারা,
ইহকালে আর পরকালে মোর কেহ কোথা নাই,
কেবল সোজন ছাড়া।
সাক্ষী থাকিও দরদের মাতা, সাক্ষী থাকিও
বাপ ভাই যত জন,
সোজন আমার পরানের পতি, সোজন আমার
মনের অধিক মন।
সাক্ষী থাকিও সীথার সিঁদুর, সাক্ষী থাকিও
হাতের দু'গাছি শাঁখা,
সোজনের কাছ হইতে পেলাম এজনমে আমি
সব চেয়ে বড় দাগা।"

দুলী। দুলী।। তবে ফিরে এসো তুমি, চল দুই জনে
যেদিকে চরণ যায়,
আপন কপাল আপনার হাতে যে ভাঙিতে চাহে,
কে পারে ফিরাতে তায়?
ভেবে না দেখিলে, মোর সাথে গেলে কত দুখ তুমি
পাইবে জনম ভরি,
পথে পথে আছে কত কণ্টক, পায়েতে বিঁধিবে
তোমারে আঘাত করি।
দুপুরে জ্বলিবে ভানুর কিরণ, উনিয়া যাইবে
তোমার সোনার লতা,
ক্ষুধার সময় অন্ন অভাবে কমল বরন
মুখে সরিবে না কথা।

রাতের বেলায় গহন বনেতে পাতার শয়নে
যখন ঘুমায়ে রবে,
শিয়রে শোসাবে কাল অজগর, ব্যাঘ্র ডাকিবে
পাশেতে ভীষণ রবে।
পথেতে চলিতে বেতের শীষায় আঁচল জড়াবে,
ছিঁড়িবে গায়ের চাম,
সোনার অঙ্গ কাটিয়া কাটিয়া ঝরিয়া পড়িবে
লহু ধারা অবিরাম।

সেদিন তোমার এই পথ হতে ফিরিয়া আসিতে
সাধ্য হবে না আর,
এই পথে যারা এক পাও চলে, তারা চলে যায়
লক্ষ যোজন পার।
এত আদরের বাপ-মা সেদিন বেগানা হইবে—
মহা শত্রুরও চেয়ে,
আপনার জন তোমারে বধিতে যেখানে সেখানে
ফিরিবে সদাই ধেয়ে।
সাপের বাঘের ডরেতে এ পথে রহিবে সদাই
যত না শঙ্কা ভরে,
তার চেয়ে শত শঙ্কা-আকুল হইবে যে তুমি,
বাপ ভাইদের ডরে।
লোকালয়ে আর ফিরিতে পাবে না, বনের যত না
হিংস্র পশুর সনে,
দিনেরে ছাপায়ে, রাতেরে ছাপায়ে রহিতে হইবে
অতীব সঙ্গোপনে।

খুব ভাল করে ভেবে দেখ' তুমি, এখনো র'য়েছে
ফিরিবার অবসর,
শুধু নিমিষের ভুলের লাগিয়া কাঁদিবে যে তুমি,
সারাটি জনম ভর।"

"অনেক ভাবিয়া দেখেছি সোজন, তুমি যেথা রবে,
সকল জগতখানি—
শত্রু হইয়া দাঁড়ায় যদিবা, আমি ত তাহারে
তৃণ সম নাহি মানি।
গহন বনেতে রাতের বেলায় যখন ডাকিবে
হিংস্র পশুর পাল,
তোমার অঙ্গে অঙ্গ জড়ায়ে রহিব যে আমি,
নীরবে সারাটি কাল।
পথে যেতে যেতে ক্লান্ত হইয়া এলায়ে পড়িবে
অলস এ দেহখানি,
ওই চাঁদ মুখ হেরিয়া তখন শত উৎসাহ
বুকেতে আনিব টানি।

বৃষ্টির দিনে পথের কেনারে মাথার কেশেতে
রচিয়া কুটিরখানি,
তোমারে তাহার মাঝেতে শোয়ায়ে সাজাব যে আমি
বনের কুসুম আনি।

ক্ষুধা পেলে তুমি উঁচু ডালে উঠি থোপায় থোপায়
পাড়িয়া আনিও ফল,
বুকের আঁচল টানিয়া যে আমি মুছাইয়া দিব
মুখেতে ঘামের জল।
'নল ভেঙে আমি জল খাওয়াইব', বন পথে যেতে
যদি পায়ে লাগে ব্যথা,
গানের সুরেতে শুনাইব আমি শ্রান্তি নাশিতে
সে শিশুকালের কথা।
তুমি যেথা যাবে সেখানে বন্ধু শিশু বয়সের
দিয়ে যত ভালবাসা,
বাবুই পাখির মত উঁচু ডালে অতি সযতনে
রচিব সুখের বাসা।
দূরের শব্দ নিকটে আসিছে, কথা কহিবার
আর অবসর নাই,
রাতের আঁধারে চল এই পথে, আমরা দু'জন
বনছায়ে মিশে যাই।"

"সাক্ষী থাকিও আল্লা রসুল, সাক্ষী থাকিও
যত পীর আউলিয়া,
এই হতভাগী বালিকারে আমি বিপদের পথে
চলিলাম আজি নিয়া।
সাক্ষী থাকিও চন্দ্র সূর্য্য—সাক্ষী থাকিও
আকাশের যত তারা,
আজিকার এই গহন রাতের অন্ধকারেতে
হইলাম ঘর ছাড়া।

সাক্ষী থাকিও খোদার আরশ, সাক্ষী থাকিও
নবীর কোরান খানি,
ঘর ছাড়াইয়া, বাড়ী ছাড়াইয়া কে আজ আমারে
কোথা লয়ে যায় টানি।
সাক্ষী থাকিও শিমুলতলীর যত লোকজন,
—যত ভাই-বোন সবে,
এ-জনমে আর সোজনের সনে, কভু কোনখানে
কারো নাহি দেখা হবে।
জনমের মত ছেড়ে চলে যাই শিশু বয়সের
শিমুলতলীর গ্রাম,
এখানেতে আর কোন দিন যেন নাহি কহে কেহ
সোজন তুলীর নাম।”

১৩

জটার উপর কঙ্কণ থুইয়া,
হরগৌরী নাচে পর্ব্বত লইয়া।
লোহার লাঙল লোহার মই,
ওরে দেওদানা যাইবে কই।
চণ্ডী বুলে যার নাগাল পাই,
ঘাড় ভাইঙ্গা তার রক্ত খাই।
আমার মন্ত্র লড়ে চড়ে,
ঈশ্বর মহাদেবের মস্তক দিড়া ভূমিত পড়ে।

—শিরালীর মন্ত্র

কি হল—কি হল, নমুর পাড়ায় বিয়ের বাজনা
হঠাৎ থামিল কেন ?
সারা গাঁও ভরি মহা কোলাহল, উঁচু হ'তে আরো
উঁচুতে উঠিছে যেন।
কি হল—কি হল।—ঘাটে-মাঠে-পথে-বনে-জঙ্গলে
খোঁজ—খোঁজ—খোঁজ সাড়া,
বাঘার ভিটায়, শ্মশান ঘাটায়, পাকুড় তলায়—
ত্রস্তে ছুটিছে কারা ?
কি হল—কি হল।—ধাপ-দামে-ঘেরা রায় দীঘি জল
ওলট পালট করি,
কি যেন খুঁজিয়া ফিরিছে নমুরা, পদ্মের পাতা
দুহাতে সরায়ে ফেলি।

চারিদিকে ঘন কালো আঁধিয়ার, তারি মাঝখানে
'ওই—গেল—গেল' সুর,
কখনো এখানে, কখনো সেখানে, কভু জোড়া লাগি
ভাঙিয়া হইছে চূর।
ওই—গেল—গেল। গজনীর মাঠ, সরিষার বিল—
পার হয়ে চলে যায়।—
হাতে হাত-লাঠি, মশাল জ্বালিয়া ক্ষিপ্ত নমুরা
বাতাসের আগে ধায়।
ওই—গেল—গেল। বেতবন ছাড়ি—বারোয়ারীতলা,
—তাহারো খানিক বামে,
মচ্ মচ্ করে শব্দ আসিছে, এইবার বুঝি
বাঙড়ের বিলে নামে।
ওই—গেল—গেল।—চলো ছুটে চল, সড়কি ঘুরাও,
—হাতে লও হাত-লাঠি!
পায়ের চিহ্ন দেখে দেখে চল, যত কাঁটা লতা
দুই হাতে কাটি কাটি।
নমুর গরব নিয়ে গেছে তারা, কাড়িয়া আনিতে
সাধ্য রয়েছে কার?
—সাপের মাথায় পাও ফেলে ফেলে,—বাঘের সঙ্গে
চলিতে হইবে তার।

আসমান-সম নমুর গরবে গিয়াছে তাহারা
কলঙ্ক-কালী দিয়া,
এর প্রতিশোধ লইতে হইবে, যেখানেই তারা
থাক্ নাকো লুকাইয়া।

আকাশ হইতে ছিঁড়িয়া আনিব তীক্ষ্ণ কঠিন
বর্শার ঘায়ে ঘায়ে,
পাতাল খুঁড়িয়া বাহির করিব, যদি বা লুকায়
পাতালের তল ছায়ে।
মাছ হয়ে যদি লুকাইয়া থাকে, শুশুক হইয়া
ধরিয়া আনিতে হবে,
সরষে হইয়া ধরায় ছড়ালে কবুতর হয়ে
খুঁজিয়া আনিব তবে।
বাতাসে মিশিলে বজ্র হইয়া শূন্যের পথে
ফিরিব আগুন ছুঁড়ি,
সাগরে মিশিলে ঝড় হয়ে তারে তাড়ায়ে ফিরিব
তরঙ্গে ঘুরি ঘুরি।

কি হ'ল,—কি হ'ল,—গাছের শাখায় বাঁধিয়া রয়েছে
বিবাহের রাঙা-চেলী,
অতসীর বনে পথের কিনারে বাঁক-খাড়ু পার
গিয়াছে তাহারা ফেলি।
এই পথ দিয়ে সরাসরি চল, বাতাসের আগে
—শব্দ চলার আগে,
হাতে হাত-লাঠি, তীর, বল্লম,—তীক্ষ্ণ কঠিন
বর্শা ঘুরাও রাগে।

কি হল,—কি হল !—আলতা-ছোপান পায়ের চিহ্ন
লেগেছে পথের গায়,
বন কেটে কেটে, সামনে এগিয়ে, দেখ দেখি আর
পথ কত দূরে যায়।
খোঁজ—খোঁজ—খোঁজ, যেথায় মিশেছে দূরের আকাশ,
—খুঁজে এসো তত দূরে,
রাত কেটে গেল,—দিবস হইল,—শ্রান্ত সকলে
বন-পথে ঘুরে ঘুরে।

কি হল,—কি হল ? "নায়েবমশায়। গরীব আমরা,
হয়েছে মাথায় বাড়ি,
নমুর কুলেতে কলঙ্ক দিয়ে চ'লে গেছে চোরা,
লোকের আবাস ছাড়ি।
ধোপ-কাপড়েতে দাগ লাগিয়াছে, পাহাড় ভাঙিয়া
পড়েছে মাটির পরে,
বিবাহের কনে পালায়ে গিয়াছে, না জানি সে কোন্
বেগানার হাত ধরে।"

"কাজীর গেরামে খবর নিয়েছ ?" "সোজনের সেথা
পাওয়া যায়নাক দেখা,
কালকে বিকালে কেহ কেহ তারে ঘুরিতে দেখেছে
শিমুলতলীতে একা।"

"যা ভেবেছি তাই, হাতে লও লাঠি, সড়কী ঘুরাও,
হাঁক মার, মার ডাক ;
স্বর শুনে তার আকাশ বাতাস, পাতাল ফাটিয়া
চৌচির হয়ে যাক্ ।
গ্রাম জ্বালাইবি—বন পোড়াইবি—মুণ্ডু কাটিবি,—
যারে যেথা পাবি খুঁজে,
তার পর আছে সদর কাছারী, থানার দারগা,
আমি নিব সব বুঝে !
ডিগ্রী করিয়া ডিগ্রী-জারীতে ভিটে মাটি ঘর
লইব নিলাম করি,
হাহাকার করে কাঁদিয়া ফিরিবে পথে পথে তারা,
বলিনু শপথ করি।"

১৪

কোমরে চেত্তির পাটি, জরির পটকা আটি, তার পরে বান্ধে তলয়ার,
খঞ্জর কাটারী-ছুরি ডাহিনে বামেতে ধরি গোস্থায় বলেন মার মার।

*   *   *

ঘোশবাড়ে রণে যেতে, আমীরের ঢাল হাতে সেই ঢাল রাখেন পিঠেতে।
হাতে লেজা তলয়ার, কান্ধে বান্ধে ঢোল-ফকার
হাতিয়ার তামাম লেন হাতে।   —জারীনাচের গান

আজকে হবে মলুদ-শরীফ্ কাজীর গাঁয়ে মোল্লা-বাড়ী,
দু'দিন ধরে আগর বাগড় হচ্ছে নানান জোগাড় তারি।
ভাট্‌-গেঁয়োদের করলে দাওয়াত খাঁ-পুরারা বেজার হবে,
ওদিকে রয় মুরাল দাহ, কি কথা বা তারাই কবে?
ভাজন ডাঙার কাজীর পোরা, কমলা পুরের মিরধা-বাড়ী,
টেপা খোলার আছেল খাঁরা কেবল মানুষ যায় যে বাড়ি।
সাত গেরামেই রইল দাওয়াৎ, চোখ বুঁজে ত যায় না থাকা।
কাউরে কোথাও বাদ দিয়ে যে কাউরে আবার যায় না রাখা।

শনিবারের রাতের বেলায় মোল্লা বাড়ীর উঠান পরে,
সাত গেরামের মানুষ এসে জমলো নানান খুশীর ভরে।
কে কাহারে চিন্‌তে পারে, মদন কলু ঘুরায় ঘানি,
সে ব'সেছে সবার আগে হস্তে লয়ে ছোড়মাদানী।

নিদান ফকীর জন খেটে খায়, কেবা তাহার খবর রাখে ?
মুন্সী-সাবের হস্ত হ'তে গোঁপ ভরিয়া আতর মাখে।
কলিমদ্দি কুলীর পোলা, কয়লা ভরা ময়লা দেহ,
আজকে তারে দেখ্‌লে পরে ভাবতে তাহা পারবে কেহ ?
কে বলিবে অলী-মামুদ কাদায় নিড়ায় সারাটা দিন,
ছিটের জামা গায় পরে সে সেজেছে আজ নওশা নবীন।
সবার মাথায় রঙিন টুপি, কখন দোলে কখন হেলে,
ভেস্ত লুটে ফুল গুলি কে মাটির ধরায় দিচ্ছে ফেলে,
মোল্লা-বাড়ীর উঠানে কে সোনার কাঠি হস্তে ধরি,
সারা গাঁয়ের রূপখানি আজ দিয়ে গেছে বদল করি।

কে বলিবে এরাই গাঁয়ে ভায়ের মাথায় লাগায় বাড়ি,
কাইজা ক'রে ফসাদ ক'রে ভর্ত্তি করে জেলের বাড়ী।
এরাই চাষী রুক্ষ ভাষী, বুনো জানোয়ারের মতন—
গাল পাড়িয়ে আদর দেখায়, লাঠির আগায় দেখায় যতন।
সে সব যেন খোলস ওদের, আজকে তাহা ফেলিয়া দূরে,
বেশ ভূষাতে রঙিন হ'য়ে বসেছে এই মফেল জুড়ে।
কে আনিয়া আরব দেশের জায়-নমাজের খেজুর পাটি,
মোল্লা-বাড়ীর উঠান পরে দিয়ে গেছে হর্ষে পাতি।
সামিয়ানার চাদর খানা ঝুলছে সবার মাথার পরে,
তাহার সাথে রমজানেরি চাঁদের ফালি নৃত্য করে।
হয়ত রছুল দীনের নবী এই চাঁদেরে সাক্ষী করি,
হীরা-গিরির শিখর হ'তে উঠেছিলেন কোরান পড়ি।
—হয়ত আজো সোয়ার হ'য়ে এই চাঁদেরি সোনার নায়ে,
ভেস্ত ছেড়ে এই মফেলে এসেছেন এ কাজীর গাঁয়ে।

চারিদিকেতে লোক বসেছে, 'আসেন বসেন' মুখের কথা,
তাজীম-মাফিক নেওন-দেওন সাধ্য কি যে হয় অন্যথা।
মধ্য খানে মনির মিঞা, মুখ ভরা তার শুভ্র দাড়ী,
লুবানেরি ধূয়ার মতন হাওয়ায় লোটে গন্ধ তারি।
মুখখানিতে আরব-দেশের চাঁদের মতন রশ্মি ঝরে,
সামনে লয়ে কোরান-কেতাব মুন্সি সাহেব মলুদ পড়ে।
মুন্সী-সাহেব বয়ান করেন,"দীনের নবী, মেষের রাখাল,
কি যে ব'সে ভাবেন সদা কোন দিকেই নাইক খেয়াল।
মাথার পরে দুল্‌ছে বায়ে থোপায় থোপায় খোরমা গুলো,
বাবলা বনে দুম্বা চরে, গায়ে মাখা মরুর ধুলো।
ভেস্ত হ'তে আসল যে দূত কোরান শরীফ হস্তে ধ'রে।
বয়ান করেন মুন্সী সাহেব আতসেরি লেবাছ পরে,
দাঁড়িয়ে সেদিন দীনের নবী হীরা-গিরির চূড়ার পরে,
'আল্লাহ আকবর' ধ্বনিল দিকদিগন্ত মুখর করে।

তার পরেতে কোরেশদেরি হাতে তাহার কি লাঞ্ছনা,
চোখের জলে মুন্সী-সাহেব করল কেঁদে সে বর্ণনা।
অবিশ্বাসীর কেল্লা মাঝে চলছে একা দীনের নবী,
হাতে তাহার খোদার কোরান, বুকে তাহার খোদার ছবি।
মাথার পরে ঝুলছে অসি, সামনে পিছে ঘুরছে খাঁড়া,
চৌদিকেতে কাফের, যেন হিংস্র বুনো ব্যাঘ্র তারা।
শিষ্যেরা কয়, "প্রাণ থাকিতে একলা তোমায় না পাঠাব,
যেতে যদি হয়ই এমন আমরা ক'জন সঙ্গে যাব।"
"একলা নহে হে বন্ধুরা", দীনের নবী ডাক দিয়ে কয়,
"সঙ্গে আমার আছেন সাথী, তোমরা কেহ করবে-না ভয়।

পাথর মাঝে কীটের বাসা, আহার যোগায় তারেও যিনি,
ইঙ্গিতে যার চলছে ধরা, আমার বুকের ভরসা তিনি।"
এই ভাবেতে মুন্সী-সাহেব হজরতেরি জন্ম থেকে,
মরণ-তক্ সে সব কাহিনী করল বয়ান একে একে !
দীনের নিশান হস্তে লয়ে মক্কা পুনঃ ফিরছে নবী,
হাতে তাঁহার চাঁদের ঝলক্, মুখে তাঁহার জ্বল্ছে রবি।
সঙ্গে চলে শিষ্যেরা সব বিশাল বাহু উন্নত শির,
আল্লা ছাড়া কারো কাছে হয় না নত এই ধরণীর।
অবিশ্বাসীর কেল্লা মাঝে ভীষণ-তর উঠল যে ত্রাস,
মহম্মদ আজ সামনে পেলে ধনে প্রাণে কর্বে বিনাশ।

এমন সময় খবর এলো,—কিসের খবর ? কিসের খবর ?
সবার মুখেই ব্যস্ততা ভাব, কিবা ছোটর কিবা বড়র ?
কিসের খবর ? কিসের খবর ? মুন্সী সাহেব কেতাব থুয়ে
ছদন মিঞায় সামনে ডাকি কি কথা বা বলছে নুয়ে ?
কিসের খবর ? কিসের খবর ? মদন কুলু লাফিয়ে উঠে,
মাল কোঁছাতে পরল কাপড়, ধরল লাঠি শক্ত মুঠে।
কিসের খবর ? কিসের খবর ? ছদন মোড়ল দৌড় মারিয়া
বোঝা কয়েক সড়কী লাঠি কোথা হতে আসল নিয়া।
কিসের খবর ? কিসের খবর ? বদরদ্দীর রামদা কোথায় ?
নিজাম ঢালীর ঢাল কোথা আজ ? এক পলকে আয় নিয়ে আয়।
কিসের খবর ? কিসের খবর ? কাজীর চকের মধ্য-খানে
ও—ও—ও—উঠ্ছে যে হাঁক কাল বোশেখীর ঝড়ের গানে।

মেঘনা নদে বান ডেকেছে—ঢেউ ছুটেছে ক্ষিপ্ত হ'য়ে,
ফেন ছড়ায়ে সর্ব্বনাশের জুড়বে খেলা দু'তীর ল'য়ে।
মশাল পরে জ্বল্‌ছে মশাল, আগুন দিয়ে রাতের বুকে,
সর্ব্বনাশের নাচন নাচি কোন্ ক্ষ্যাপা আজ হাসছে সুখে।
সেই আগুনে পুড়বে গেরাম, পুড়বে নদী, পুড়বে নালা,
শিখা তাহার গগন ছুঁবে, তবু নাহি মিটবে জ্বালা।

"দাঁড়াও তবে, দাঁড়াও গাঁয়ের যে যেখানে বীর পালোয়ান,
হস্তে লহ হাতের লাঠী, কোমরেতে ঝুলাও কৃপাণ।
সড়কী আন—রামদা আন, থাল বাজায়ে নৃত্য কর,
'আলী-আলী' শব্দ করি, আকাশ জমিন পাতাল ভর।
কাজীর গাঁয়ের সুনাম আজি নিয়ে চল মুঠার তলে,
এবার তাহার পরখ হবে বাহুর বলে, বুকের বলে।
তোমার খোঁজে কাজীর গাঁয়ে তারাই আজি আসছে হেঁকে,
শিমুলতলী, শিমুলতলী। বজ্র ছড়াও মেঘের থেকে।
পাহাড় ভেঙে বহ্নি ছড়াও দোল দিয়ে আজ সিন্ধু জলে,
—ফেনিল ফণা ঢেউকে ছুটাও সর্ব্বনাশের এ হিন্দোলে।

দোহাই দোহাই মুন্সী সাহেব, তোমার দুখান চরণ ধরি,
তোমার কথা আজের মত থাকুক কোরান কেতাব ভরি।
আজকে মোরা বলব কথা লাঠির আগায় লাঠির আগায়,
আজকে মোরা লিখব কথা বুকের তাজা রক্ত লেখায়।
তোমার কথা শুনব সেদিন, যদি আবার ফিরতে পারি,
যদি আবার হয় আমাদের শিমুলতলীর বসত বাড়ী।

"তবু আমার একটি কথা—একটি কথা মানতে হবে,
নইলে এ জান কবচ করে কাইজাতে আজ যাওগে সবে।"

"না-না মোরা মানব নাক, কিছুতেই আজ মানব নাক,
আজের মত সকল কথা কোরান-কেতাব ভরিয়ে রাখ।
তোমার কথা রাখতে যেয়ে শিমুলতলীর বসত-বাড়ী,
হাতের লাঠি থাকতে হাতে চোরের মত এলাম ছাড়ি।
চৌদ্দ-পুরুষ বাপ-দাদারা করেছে যেই গেরামে,
কাইজা করে, দাঙ্গা করে আনছে গরব তাহার নামে ;
তাদের বংশধর আমরা তোমার একটা কথার তরে,
রাতের বেলা পালিয়ে এলাম কজন গেঁয়ো নমুর ডরে।
মুন্সী সাহেব—মুন্সী সাহেব ! আজকে তুমি চাও ফিরিয়া,
কি করেছ মোদের তুমি নিমেষ তরে লও ভাবিয়া।
বাঘের ছেলে আজকে মোরা, মেষের মত চরছি মাঠে ;
সর্প-শিশুর ফণার পরে পা ফেলি আজ ভেক যে হাঁটে।
তাইতে এত সাহস নমুর,—নইলে কোথা শিমুলতলী,
আর কোথা এই কাজীর গেরাম, এতটা পথ আসছে দলি ;
—আসছে তারা এই সাহসে, ভয়ে যারা পালিয়ে বেড়ায়,
তাদের মুখে মক্ষিকারাও দুলো পায়ের লাথি বাড়ায়।
শিমুলতলী—শিমুলতলী, আজকে ইহার জবাব যে চাই,
নইলে যেন কালকে দেখি শিমুলতলীর একজনও নাই।"

"তবু আমার একটি কথা,—বৃদ্ধ আমি সকল জনম
শিমুলতলীর দুঃখে সুখে গ'ড়েছি মোর ধরম করম।
মফেস্বল জুড়ে মলুদ পড়ি' ঈদের মাঠে ওয়াজ করি'
আশি বছর শিমুলতলীর জড়িয়ে আছি সকল ভরি।

আশি-বছর শিমুলতলীর দুখের সাথে মোর পরিচয়,
আশি-বছর শিমুলতলীর ভাগ্যে আমার ভাগ্য হৃদয়।
এক দিনোত জোয়ান ছিলাম, ছিল তখন বাহুর লড়াই,
বুকের পাটায় থাপড়িয়ে হাত তখন মোরা আগুন জ্বালাই।
আজ সে বুকে হাড় ক'খানা, নাড়া দিলেই পড়বে খ'সে,
তবু এখন ঘরের কোণে থাকতে নাহি পারব বসে।
তোমরা যদি সবাই যাবে, সঙ্গে লহ আমায় তবে,
মরণ যদি হয়ই এমন, সেই মরণের গরব রবে।"

"মুন্সী-সাহেব—মুন্সী-সাহেব। আজকে তোমায় মাথায় করি,
ইচ্ছে করে নেচে বেড়াই মোদের সারা গেরাম ভরি।
আর আমাদের নাই পরাজয়, আশি-বছর হেলায় ঠেলে
তোমার মত বয়স-বুড়ো যোগ দিলে যে মরণ খেলে;
এই খেলারে রুখবে বলে' এমন সাধ্য কাহার নাহি,
তোমায় মোরা মাথায় করে 'আলি' 'আলি' শব্দ গাহি।
মুন্সী-সাহেব—মুন্সী-সাহেব। এবার তুমি হুকুম কর,
শিমুলতলীর সুনাম কথায় আবার মোদের পরান ভর।"

"কথার এখন নাই অবসর, হাতে লহ হাতের লাঠি,
হু-হুঙ্কারে লাফিয়ে উঠে কাঁপাও আকাশ, কাঁপাও মাটি।
মাঠ ভরে আজ গর্জ্জে নমু, ওই তাহারা পড়ল এসে।
শিমুলতলীর গাঁয়ের ছেলে, এবার সাজ বীরের বেশে।
—সাপের মত দুলাও ফণা—ঝড়ের মত গর্জ্জি উঠ—
ঘুর্নিপাকে ঘুরিয়ে লাঠি কাজীর চকের মধ্যে ছোট।"

দলে দলে লোক সাজিল, হাতে হাতে জ্বলল মশাল,
কালবোশেখীর ঝড় ছুটিল, চৌদিকেতে সামাল-সামাল।
মদন-কুলু ক্ষিপ্ত আজি, দল বেড়িয়া নৃত্য করে,
অট্ট হাসি ঠিকরে পড়ে কিড়ি মিড়ি মন্ত্র ভরে।

"ডাক-ডাকিনী ভূত-পেঁতেনী দেও-দানারা আয় ছুটে আয়।
কাল্‌নিশা আর কণ্ঠনিশা, পাতাল নিশা রইলি কোথায় ?
রইলি কোথায় আওলাকেশী, পাগল-বেশী, কাল-কুমারী,
রাধি কুমার, পাতাল কুমার আয় ছুটে আয় পাতাল ছাড়ি।
পিঙল জটা মেঘের ঘটা আয় চলে আয় অন্ধনিশা
আড়বেতে আর পরবেতে আয় আঁধার করে সকল দিশা।
আয় চলে আয় ঝটকা বায়ে দমের মাদার দুলিয়ে জটা,
আয় চলে আয় দক্ষিণা-রাও, বরণ যাহার মেঘের ঘটা।
ষোলশো ভূত সঙ্গে ক'রে শ্মশান কালী আয় নেচে আয়,
ধুনা-মুনা-ছাক্কারা আয় এই তুফানের মত্ত খেলায়।
ঈশান কোণের আয়রে ঈশান, মন্ত্র পড়ে সবাই ডাকি,
ওলই চণ্ডী, পোলোই চণ্ডী, শ্মশান-কালী আয়রে হাঁকি।

ধুল্‌ ধুলা ধুল্‌ মুঠার ধুলা আলীর নামে ফুক্‌ ছাড়িয়া—
জোর পবনে উড়িয়ে দিলাম, মরণ খেলায় যাও ছুটিয়া।
যাওরে ধুলা ডাক ছাড়িয়া, যাওরে ধুলা অট্টহাসি',
বুকে বুকে ছাড়াও তুমি বজ্র হ'তে অগ্নি-রাশি।

শিমুলতলী—শিমুলতলী ! কাজীর গেরাম মুরাল দাহ,
ঝড় বাদলের মত্ত খেলায় 'আলী আলী' শব্দ গাহ।
—ওই আসিছে মত্ত নমু—'আলী-আলী হজরত আলী।'
লাফিয়ে চল ভাইরা আমার, হাতে হাতে মশাল জ্বালি।"
মুসলমানের দল ছুটিল 'মার মার মার' ডাক ছাড়িয়া,
কলুর ডিহি পার হইয়া, কাজীর চকের মধ্য দিয়া।
চল্‌ল তারা জীবন লয়ে—চল্‌ল তারা মরণ লয়ে,
চল্‌ল তারা জাহান্নামের বহ্নি শিখা মাথায় বয়ে।
শব্দে তাদের রাতের বায়ু থেকে থেকে উঠ্‌ছে কাঁপি,
মশাল পরে রাতের আঁধার করছে যেন দাপাদাপি।

১৫

দেশাল সিন্দূর চায়নারে ময়না,
আবেরি ময়না ঢাকাই সিন্দূর চায় ;
ঢাকাই সিন্দূর পরিয়া ময়নার গরমি ছোটে গায়।
ডান হস্তে শামলা গামছা,
বাম হস্তে আগেরি পাঙ্খা,
হারে দামান ঢুলায় বালীর গায়।

—মুসলমান মেয়েদের বিবাহের গান

গড়াই নদীর তীরে,
কুটীর খানিরে লতা পাতা ফুল মায়ায় রয়েছে ঘিরে।
বাতাসে হেলিয়া, আলোতে খেলিয়া সন্ধ্যা সকালে ফুটি'
উঠানের কোণে বুনো ফুলগুলি হেসে হয় কুটি কুটি।
মাচানের পরে শীম-লতা আর লাউ কুমড়ার ঝাড়—
আড়া-আড়ি করি দোলায় দোলায় ফুল-ফল যত যার।
তল দিয়ে তার লাল নটে শাক মেলিছে রঙের ঢেউ,
লাল শাড়ীখানি রোদে দিয়ে গেছে এ বাড়ীর বধূ কেউ।
মাঝে মাঝে সেথা এঁদো ডোবা হতে ছোট ছোট ছানা লয়ে,
ডাহুক মেয়েরা বেড়াইতে আসে গানে গানে কথা কয়ে।
গাছের শাখায় বনের পাখিরা নির্ভয়ে গান ধরে,
এখনো তাহারা বোঝেনি হেথায় মানুষ বসত করে।

মটরের ডাল, মসুরের ডাল, কালজিরা আর ধনে,
লঙ্কা-মরীচ রোদে শুখাইছে উঠানেতে সযতনে।
লঙ্কার রঙ, মসুরের রঙ, মটরের রঙ আর,
জীরা ও ধনের রঙের পাশেতে আলপনা আঁকা কার।

সামনে তাহার ছোট ঘরখানি ময়ূর পাখীর মত,
চালার দুখানা পাখনা মেলিয়া তারি ধ্যানে আছে রত।
কুটির খানির এক ধারে বন, শ্যাম ঘন ছায়া তলে,
মহা রহস্য লুকাইয়া বুকে সাজিছে নানান ছলে।
বনের দেবতা মানুষের ভয়ে ছাড়ি ভূমি সমতল,
সেথায় মেলিছে অতি চুপি চুপি সৃষ্টির কৌশল।
লতা-পাতা-ফুল-ফলের ভাষায় পাখিদের বুনো সুরে,
তারি বুকখানি সারা বন বেড়ি ফিরিতেছে সদা ঘুরে।
ইহার পাশেতে ছোট গেহ-খানি, এ বনের বন-রাণী,
বনের খেলায় হয়রাণ হয়ে শিথিল বসনখানি ;
ইহার ছায়ায় মেলিয়া ধরিয়া শু'য়ে ঘুম যাবে বলে,
মনের মতন করিয়া ইহারে গড়িয়াছে নানা ছলে।

সে ঘরের মাঝে দু'টি পা মেলিয়া বসিয়া একটি মেয়ে,
পিছনে তাহার কালো চুলগুলি মাটিতে পড়েছে বেয়ে।
দু'টি হাতে ধরি রঙিন শিকায় রচনা করিছে ফুল,
বাতাসে সরিয়া মুখে উড়িতেছে কভু দু একটি চুল।
কুপিত হইয়া চুলেরে সরাতে ছিঁড়িছে হাতের সুতো
চোখ ঘুরাইয়া চুলেরে শাসায় করিয়া রাগের ছুতো।
তারপর শেষে আপনার মনে আপনি উঠিছে হাসি,
আরো সরু সরু ফুল ফুটিতেছে শিকার জালেতে আসি।
কালো মুখখানি, বন-লতা-পাতা আদর করিয়া তায়,
তাহাদের গার যত রঙ যেন মেখেছে তাহার গায়।
বনের দুলালী ভাবিয়া ভাবিয়া বনের শ্যামল কায়া,
জানেনা কখন ছড়ায়েছে তার অঙ্গে বনের ছায়া।

আপনার মনে শিকা বুনাইছে, ঘরের দু'খানা চাল
দুখানা রঙিন ডানায় তাহারে করিয়াছে আব-ডাল।
'আটনে'র গায়ে সুন্দীবেতের হইয়াছে কারু কাজ,
'বাজারের সাথে 'পরদা' বাঁধন মেলে প্রজাপতি সাজ।
'ফুস্থির সাথে রাঙতা জড়ায়ে 'গোখুরা' বাঁধনে আঁটি।
"উলু" ছোন দিয়ে ছাইয়াছে ঘর বিছায়ে শীতল-পাটি।
মাঝে মাঝে আছে 'তারকা' বাঁধন, তারার মতন জ্বলে,
রুয়ার গোড়ায় খুব ধ'রে ধ'রে ফুলকাটা শতদলে।
তারি গায় গায় সিঁদূরের গুঁড়ো হলুদের গুঁড়ো দিয়ে
এমন করিয়া রাঙায়েছে যেন ফুলেরা উঠেছে জিয়ে।
এক পাশে আছে ফুল্‌চাং বাঁধা নানা কারুকাজে ভরা,
চাল ভাল কিবা ফুল্‌চাং ভাল বলা যায় নাক ত্বরা।
তার সাথে বাঁধা 'কেলী-কদম্ব' 'ফুল ঝুরি' শিকা আর,
'আসমান-তারা' শিকার রঙেতে সব রঙ মানে হার।
শিকায় ঝুলানো চিনের বাসন, নানান রঙের শিশি,
বাতাসের সাথে হেলিছে দুলিছে রঙে রঙ দিবানিশি।
তাহার নীচেতে মাদুর বিছায়ে মেয়েটি বসিয়া একা,
রঙিন শিকার বাঁধনে বাঁধনে রচিছে ফুলের লেখা।

মাথার উপরে আটনে ছাটনে বেতের নানান কাজ,
ফুল্‌চাং আর শিকাগুলি ভরি দুলিতেছে নানা সাজ।
বনের শাখায় পাখিদের গান, উঠানে লতার ঝাড়,
সবগুলো মিলে নির্জ্জনে যেন মহিমা রচিছে তার।
মেয়েটি কিন্তু জানে না এসব, শিকায় তুলিছে ফুল,
অতি মিহিসুরে গান সে গাহিছে মাঝে মাঝে করি ভুল।

বিদেশী তার স্বামীর সহিত গভীর রাতের কালে,
পাশা খেলাইতে ভানুর নয়ন জড়াল ঘুমের জালে।
ঘুমের ঢোলনী, ঘুমের ভোলনী—সকলে ধরিয়া তায়,
পাল্কীর মাঝে বসাইয়া দিয়া পাঠাল স্বামীর গাঁয়।
ঘুমে ঢুলু ঢুলু আঁখি, পাল্কী দোলায় চৈতন হ'ল তার,
চৈতন হ'য়ে দেখে সে'ত আজ নহে কাছে বাপমার।
এত দরদের মা-ধন ভানুর কোথায় রহিল হায়,
মহিষ মানত করিত তাহার কাঁটা যে ফুটিলে পায়।
হাতের কাঁকনে আঁচড় লাগিলে যেত যে সোনারু বাড়ী,
এমন বাপেরে কোন্ দেশে ভানু আসিয়াছে আজ ছাড়ি।
কোথা সোহাগের ভাই-বউ তার মেহেদী মুছিলে হায়,
আপন সিঁথার সিঁদুর চাহিত ঘসিতে ভানুর পায়।
কোথা আদরের মৈফল-ভাই ভানুর আঁচল ছাড়ি,
কি করে আজিকে দিবস কাটিছে একা খেলাঘরে তারি'।

এমনি করিয়া বিনায়ে বিনায়ে মেয়েটি করিছে গান,
দূর বন-পথে 'বৌ কথা কও' পাখি ডেকে হয়রাণ।
সেই ডাক আরো নিকটে আসিল পাশের ধঞ্চেখেতে,
তার পর এ'লো তেঁতুল তলায় কুটিরের কিনারেতে।
মেয়েটি খানিক শিকা তোলা রাখি অধরেতে হাসি আঁকি
পাখিটিরে সে যে রাগাইয়া দিল 'বউ কথা কও' ডাকি।
তার পর শেষে আগের মতই শিকায় বসাল মন,
ঘরের বেড়ার অতি কাছাকাছি পাখি ডাকে ঘন ঘন।
এবার সে হ'ল আরও মনোযোগী, শিকা তোলা ছাড়া আর,
তার কাছে আজ লোপ পেয়ে গেছে সব কিছু দুনিয়ার।

দোরের নিকট ডাকিল এবার' বউ কথা কও পাখী,
'বউ কথা কও' 'বউ কথা কও,' বারেক ফিরাও আঁখি।
বউ মিটি মিটি হাসে আর তার শিকায় যে ফুল তোলে,
মুখপোড়া পাখী এবার তাহার কানে কানে কথা বলে।

"যাও—ছাড়—লাগে," "এবার বুঝিনু বউ তবে কথা কয়,
আমি ভেবেছিনু সব বউ বুঝি পাখির মতন হয়।
হয়ত এমনি পাখির মতন এ-ডাল ও-ডাল করি,
'বউ কথা কও' ডাকিয়া ডাকিয়া জনম যাইবে হরি।
হতভাগা পাখি! সাধিয়া সাধিয়া কাঁদিয়া পাবে না কুল,
মুখপোড়া বউ সারাদিন বসি শিকায় তুলিবে ফুল।"
"ইস্থিরে মোর কথার নাগর। বলি ও কি করা হয়,
এখনি আবার কুঠার নিলে যে, বসিতে মন না লয়?"
"তুমি এইবার ভাত বাড় মোর, একটু খানিক পরে,
চেলা কাঠগুলো ফাঁড়িয়া এখনি আসিতেছি ঝট করে।"

"কখনো হবে না, আগে তুমি বস," বউটি তখন উঠি।
ডালায় করিয়া হুড়ুমের মোয়া লইয়া আসিল ছুটি।
এক পাশে তার তিলের পাটালী নারিকেল লাড়ু আর
ফুল লতা আঁকা ক্ষীরের তক্তি দিল তারে খাইবার।
কাঁশার গেলাসে ভ'রে দিল জল, মাজা-ঘসা ফুরফুরে
ঘরের যা কিছু মুখ দেখে বুঝি তার মাঝে ছায়া পুরে।
হাতেতে লইয়া ময়ূরের পাখা বউটি বসিয়া পাশে
বলিল, "এসব সাজায়ে রাখিনু কোন্ দেবতার আশে?"

"তুমিও এসো না!" "হিন্দুর মেয়ে মুসলমানের সনে
খাইতে বসিয়া জাত খোয়াইব তাই ভাবিয়াছ মনে?"
"নিজেরই জাতিটা খোয়াই তাহ'লে," বড় গম্ভীর হয়ে,
টপ্ টপ্ করে যা ছিল সোজন পূরিল অধরালয়ে।

বউ ততখনে কলিকার পরে ঘন ঘন ফুঁক পাড়ি
ফুলকি আগুন ছড়াইতেছিল, দু'টি ঠোঁট গোল করি।
দুএক টুকরো ওড়া ছাই এসে লাগছিল চোখে মুখে,
ঘটছিল সেথা রূপান্তর যে বুঝি না দুখে কি সুখে।
ফুঁক্ দিতে দিতে দু'টি গাল তার উঠ্ছিল ফুলে ফুলে,
ছেলেটি সেদিকে চেয়ে চেয়ে তার হাত ধোয়া গেল ভুলে।
মেয়েটি এবার টের পেয়ে গেছে, কলকে মাটিতে রাখি,
ফিরিয়া বসিল ছেলেটির পানে ঘুরায়ে দুইটি আঁখ।

তারপর শেষে শিকা হাতে লয়ে বুনাতে বসিল ত্বরা,
মেলি বাম পাশে দু'টি পাও তাতে মেহেদীর রঙভরা।
নীলাম্বরীর নীল সায়রেতে রক্ত কমল দু'টি
প্রথম ভোরের বাতাস পাইয়া এখনি উঠেছে ফুটি।
ছেলেটি সেদিকে অনিমেষ চেয়ে, মেয়েটি পাইয়া টের,
সাড়ীর আঁচলে চরণ দুইটি ঢাকিয়া লইল ফের,

ছেলেটি এবার ব্যস্ত হইয়া কুঠার লইল করে,
এখনি সে যেন ছুটিয়া যাইবে চেলা ফাড়িবার তরে।
বউটি তখন পার' আবরণ একটু লইল খুলি;
কি যেন খুঁজিতে ছেলেটি আসিয়া বসিল আবার ভুলি।

এবার বউটি ঢাকিল দু'পাও সাড়ীর আঁচল দিয়ে,
ছেলেটি সজোরে কলকে রাখিয়া টানিল হুঁকোটি নিয়ে।
"খালি দিনরাত শিকা ভাঙাইবে ? হুঁকোয় ভরেছ জল ?
কটার মতন গন্ধ ইহার একেবারে অবিকল।"
"এক্ষুনি জল ভরিনু হুঁকায়।" "দেখ! রাগায়োনা মোরে,
নৈচা আজিকে শিক পুড়াইয়া দিয়েছিলে সাফ করে ?
কটর কটর শব্দ না যেন মুণ্ডু হ'তেছে মোর,
রান্না ঘরেতে কেন এ দুপুরে দিয়ে দাও নাই দোর ?
এখনি খুলিলে ? কথায় কথায় কথা কর কাটা কাটি,
রাগি যদি তবে টের পেয়ে যাবে বলিয়া দিলাম খাঁটি।

"মিছে মিছি যদি রাগিতেই সখ, বেশ রাগ কর তবে,
আমার কি তাতে, তোমারি চক্ষু রক্ত বরণ হবে।"
"রাগিবই তবে ? আচ্ছা দাঁড়াও মজাটা দেখিয়া লও,
যখন তখন ইচ্ছা মাফিক্ যা খুশী আমারে কও!
এইবার দেখ! না! না! তবে আর রাগিয়া কি মোর হবে,
আমি ত তোমার কেউ কেটা নই খবর টবর লবে ?"

বউটি বসিয়া শিকা ভাঙাইছে, আর হাসিতেছে খালি,
প্রতিদিন সে ত বহুবার শোনে এমনি মিষ্টি গালি ;
"ও বীর পুরুষ, জানা গেছে আজ খুব পারো রাগিবারে,
বেড়ার পানেতে চেয়ে দেখ দেখি কি এঁকেছি এইধারে।
এই আঁকিয়াছি দুর্গা, ভবানী, গণেশ এঁকেছি এই,
একা গেঁয়ো ঘরে রাধা বসে আছে, কৃষ্ণ ত কাছে নেই।"

"কেন কাছে নেই ? "বোকা কোথাকার, তাহাও বলিতে হবে
কৃষ্ণ যে বনে কাঠ কাটিবারে গিয়াছিল সেই কবে ?"
"আচ্ছা এ বেটা ষাঁড়ের উপরে, কি নাম হইবে এর ?"
"তুচ্ছ ক'র না ; এটা মহাদেব রাগাইলে পাবে টের।
কৃষ্ণ চলেছে মথুরার পথে, এই রহিয়াছে আঁকা,
আর এই দেখ, রাবণ রাজার ঘুরিছে রথের চাকা।
ভেলায় ভাসিয়া বেহুলা চলেছে লখাই লইয়া কোলে,
সীথার সিঁদুর ভেসে গেছে তার গংকিনী নদী-জলে।"
সাড়ীর আঁচলে দু'টি চোখ মুছি দুলী কহে এই খানে,
"জনম দুখিনী সীতা বসে আছে, চেয়ে দেখ তার পানে।
রাজরাণী আজ পথের কাঙালী, বনবাস দিয়ে তারে
অযোধ্যাপুরী যেতে লক্ষ্মণ ফিরে চায় বারে বারে।
হারে অভাগীর কত না বেদনা, ঘাটে ঘাটে ঢেউ হানি,
দুখানি তীরের গলা জড়াইয়া কাঁদিছে গাঙের পানী।
ওকি চোখে জল ? এইখানে দেখ জগন্নাথের পুরী,
বৃন্দাবনের মন্দির দেখ ডাহিনে একটু ঘুরি।"

"সব ত আঁকিলে," সোজন কহিল, "মুসলমানের পীর
যদি রাগ করে ? কিছু অাঁক নাই তাঁহাদের কাহিনীর।"
"চোখে কি তোমার ঢেলা ঢুকিয়াছে ? চেয়ে দেখ এই ধারে,
মক্কার ঘর দাঁড়ায়ে রয়েছে প্রণাম জানাও তাঁরে।
এইখানে দেখ ধু ধু বালু ওড়ে, কারবালা ময়দান,
ফোরাতের কূলে ঢুলিয়া পড়েছে গোধুলির আসমান।
এই ধারে এই হোসেনের তাঁবু, পতির মরণ জানি,
সখিনা তাহার বিবাহের বেশ ছিঁড়িতেছে টানি টানি।

জল জল করে কাঁদে পরিজন, অভাগা হোসেন হায়,
নিজের বক্ষ নিজে আঁচড়িছে, জল যদি কোথা পায়।
এই খানে দেখ পাহাড়ের তলে শিরীফরহাদ শুয়ে,
বনের গাছটি শাখা দুলাইছে কবরে তাদের নুয়ে।
হেথায় এঁকেছি ডালিমের গাছ, তাহারি শীতল ছায়,
অভাগী মজুনু লাইলীরে লয়ে কবরেতে ঘুম যায়।
আর এইখানে আঁকিয়া রেখেছি শিমূলতলীর গাঁও,
শিমুলতলীর মসজিদ্ এই, সামনের দিকে চাও।
দূর ছাই, আমি একি করিতেছি, বেলা যে পড়েছে ঢলি,
লক্ষ্মীটি তুমি তেল মাথে দিয়ে সিনানেতে যাও চলি।"
ছেলেটি তখন লক্ষ্মীরই মত চলিল সিনান তরে,
বউটি উঠিয়া অতি ধীরে ধীরে ঢুকিল রান্না ঘরে।

*　　　*　　　*　　　*

কাঠের বোঝাটি মাথায় করিয়া সোজন কহিল, "যাই ?"
"আনিতে কিন্তু ভুলিও না তুমি যাহা বলিয়াছি তাই।"
খানিক যাইয়া ফিরিল সোজন কহিল বউরে ডাকি,
"আমাগো বাড়ীর উনির তরেতে সিঁদুর আনিব নাকি ?"
"আমাগো বাড়ীর উনির কি আজ বে-ভুল হয়েছে মন,
কাল ত এনেছে সিঁথার সিঁদুর মনে নাই এক্ষণ ?
সুন্দা ও মেথি আনে যেন আজ, কাঞ্চা হলুদ আর,
খয়েরের কথা বলিয়া বলিয়া এখন মেনেছি হার।"
"আনিব আনিব" এবার সোজন গিয়েছে একটু দূরে
বউ বলে "উনি বারেক ফিরিয়া চাহুক একটু ঘুরে।
লঙ্গ এলাচি দারুচিনি আর সেন-সেন নাকি কয়,
খানিক খানিক কিনে আনে যেন পয়সায় যদি হয়।"

[illegible]ন আনিনু ইহারি মধ্যে ফেলিয়াছ সব খেয়ে ?”
[illegible]গো বাড়ীর উনি বুঝি তাই দেখিয়াছে চেয়ে চেয়ে।
[illegible] রোজ আধমণ লাগে, আব শোন এক কথা
[illegible] শুনি সাড়ীর না কি গো নাম যে কলমীলতা ;
[illegible] শাড়ী, জলে ভাসা সাড়ী, কেলী কদম্ব সাড়ী,
গোলাপ ফুল যে সাড়ীতে না কি গো গোলাপ ফুলের বাড়ী ;
[illegible]বে আমার নাই কোন লোভ, কলমী ফুল যে নাম,
আমার বড় হাউস হয়েছে পেলে তাই পরিতাম।”
“এই কথা তুমি আগে বল নাই ? পাট বেচি দুইমণ,
ওই শাড়ী যদি নাহি কিনি আমি দেখে নিও তক্ষণ।
এখন তাহ’লে হাটে যাই আমি, গরুটারে বেঁধো ঘরে,
সন্ধ্যা হ’লেই কুটীরে ঢুকিও দ্বার যে বন্ধ করে।”
“আর শোন কথা দেরী যেন আজ হয়নাক কোন মতে,
যাও, তুমি মোরে ফিবিয়া ফিরিয়া দেখিছ ওখান হ’তে ?”
এমনি নানান সুখের সলিলে হাসে তাহাদের দিন
[illegible] তারি ভাসিয়া গিয়াছে অতীতের যত চিন।

[illegible]নের ওই কানন হইতে কাটিয়া আনিয়া কাঠ
[illegible] সোমবারে করে যে সোজন মধুমালতীর হাট।
[illegible] দুলালী লাকড়ি কাটিয়া ছোট ছোট আটি বাঁধে,
[illegible] মাঝে মাঝে নানান সেলাই করে সে মনের সাধে।
[illegible] কাছে কারো বাড়ী নাই কোন, নদীর জলের পরে
[illegible] উজান নাও বেয়ে যায় মাঝিরা পালের ভরে।
[illegible] মাঝে তারা হাল ছেড়ে দিয়ে উদাস হইয়া শোনে,
[illegible] কণ্ঠ বাজিছে একটি ঘরের কোণে।

এখনো এলোনা কালা মন আমার হল উদাসী,
বাড়িল বিরহ জ্বালা নির্ব্বাণের উপায় করি কি করি কি ?
শ্যামের আসার আশা নিয়ে, বাসর শয্যা সাজাইয়ে,
জেগে পোহাই সারা নিশী ;
সেই আসায় নৈরাশ হ'ল জাগল ব্রজের ব্রজবাসী,
মন আমার হ ল উদাসী।
—বিচ্ছেদ গান

সেদিন আসিয়া সোজন কহিল, "কাঠের বেপার ক'রে
আমাদের দিন এমনি করিয়া কাটিবেনা চির তরে।
ও গাঁয়ের এক বেপারীর নায়ে এসেছি হইয়া ভাগী,
কালকে যাইব দূরের সফরে কোষ্টা পাটের লাগি।
রাতের বেলায় কেদারীর মাতা থাকিবে তোমার কাছে
পাটের বেপারে কত লাভ হয় বুঝিতে পারিবে পাছে।"

"কাজ নাই মোর এত ভাল দিযে, এমনি গরীব হযে
আমাদের দিন কাটিযা যাউক একে অপরেরে লযে।
তা ছাড়া রয়েছে আপদ বিপদ, নমুবা পাইলে টের,
হয়ত এখনি লোক জন লযে আমাদের দেবে ঘের।"

'ছাই টের পাবে, তিন চারিদিন এর বেশী কভু নয়,
তারপর আমি চলিয়া আসিব তুমি করিও না ভয়।
পাটের বেপারে কাঁড়ী কাঁড়ী টাকা, দেখিও তোমার তরে
জলে ভাসা-সাড়ী ময়ূরের পাখা আনিব কদিন পরে।

নাকেতে বুলক, গলায় হাসলী, গোলখাড়ু দুটি পায়,
তারি তরে আমি বেপারে চলিনু সুদূর পাটের নায়।
ও দুখান হাত খালি পড়ে আছে, নাকেতে বেশর নাই,
লক্ষ্মীটি, তুমি কিছু ভেবোনাক যদি আমি দূরে যা'ই।"

তাহাই হইল, পরদিন ভোরে বেপারীর নাও আসি
সোজনেরে নিয়ে পাল তুলে দিয়ে সুদূরে চলিল ভাসি।
অভাগিনী দুলী বরণ কুলায় সাজাছে দূর্ব্বা ধান,
নৌকার গায়ে সিন্দূর তেল আর দিল গুয়াপান।
তারপর শেষে বরণ করিয়া বিদায় করিল তারে,
পাল-ভরে নাও যতদূর গেল চেয়ে রল একধারে।
সুদূর চরের আকাশের কোলে আবছা কুহেলী জালে
নৌকা মিশিল, তারপর পাল মিশে গেল এককালে।
অশ্রু সজল নয়নেতে দুলী ফিরে এলো নিজ ঘরে,
বুকখানি তার উড়ে ফিরছিল সুদূর বালুর চরে
এক দুই করে চারদিন গেল, সোজনের নাহি খোঁজ,
কলসী ভরিতে ভরেনা দুলীর একা গেঁয়ো ঘাটে রোজ।

এই গাঙ দিয়ে যত নাও আসে আর যত নাও যায়,
তাহাদের ঢেউ কুলে না লাগুক, বুকে তার লাগে হায়।
কেন সে আসেনা, কি হইল তার? এমনি প্রশ্ন যত,
আসে আর যায় দুলীর হৃদয় করি ক্ষত বিক্ষত।
রাতের বেলায় কেদারীর মাতা ঘুমাইয়া রহে পাশে,
দুলী একা ঘরে জেগে ব'সে থাকে, যদি বা সোজন আসে।

মেহেদী ছেঁচিয়া চরণ রাঙায়, সাপলার ফুল কানে,
খুব পুরু করে কাজলের রেখা কাজল নয়নে টানে।
ভালের সিঁদুর মুছিয়া মুছিয়া নতুন করিয়া পরে,
পাকা পুঁই ফল ঘসিয়া ঘসিয়া দু'টি হাত রাঙা করে।
সোজন হঠাৎ আসিবে কখন কে বলিতে পারে তাই,
মলিন সাজেতে যদি দেখে তারে, লজ্জার সীমা নাই।
তাই ভাল করে সাড়ীখানা পরে, সামনে আরসী ধরি,
সাঁচী পাণ খেয়ে দু'টি ঠোঁট লয় রাঙা টুক্‌টুকে করি।
সোজন আসিলে কোন্ কথা তারে কেমন করিয়া কবে,—
অভিমান করে ঘরের কোণেতে কোথায় লুকায়ে রবে;
এই সব তার ভাবিতে ভাবিতে রাত হয়ে যায় শেষ,
শুকতারা তার লজ্জা ঢাকিবে যেয়ে কোন দূর দেশ।

শীয়রের কাছে জ্বলিছে প্রদীপ, দুলীর সারাটি গার
বেশ ভূষা পানে উপহাস করি চাহে যেন বারবার।
টানিয়া টানিয়া বেণীরে খসায়, কান হ'তে ফুল তুলে',
ভাটীয়াল সোতে ভাসাইয়া দেয় গোড়ই নদীর কূলে।
আশার ত তবু নাহি হয় শেষ, পালের নায়ের পারা,
রঙের উপর রঙ ছড়াইয়া ভেসে চ'লে যায় তারা।
কেবা তাহাদের বাঁধিয়া রাখিবে, বালুর চরের পাখী,
—তারা উড়ে যায় শূন্যের পথে আপনার মনে ডাকি।

আজিকার দিনে ফিরে এসে যেন অতীতের দিনগুলি
দুলীর পরানে বুলাইয়া যায় কত না রঙের তুলি।

সারাদিন দুলী ঘরের দেওয়ালে তারি ছবি আঁকে একা,
কোথাও ঘষিয়া সিঁদুরের গুঁড়া কোথা হলুদের রেখা।
সেই নিশাকালে সোজনের সনে কাননের পথ ধ'রে
চলিয়াছে দুলী কাঁটা গাছগুলো সরাইয়া দুই করে।
পিছন হইতে নমুরা আসিয়া খুঁজিতেছে আঁতিপাতি,
ঝাড় জঙ্গল তোলপাড় করে জ্বালায়ে মশাল বাতি।
সেই ছবি দুলী দেয়ালে আঁকিল, কুমার নদীর সোতে
সোজনের পিঠে সোয়ার হইয়া পার হ'ল যেই মতে।

তারপর সেই গেরস্ত বাড়ী, সে বাড়ীর ছোট মেয়ে
একাদশী চাঁদ হাঁসলী পরিয়া হাসে যেন তারে চেয়ে।
দুলীরে লইয়া কি যে সে করিবে ভাবিয়া না পায় কূল,
কখনো দেখায় পুতুলগুলিরে, কভু এনে দেয় ফুল।
কভু তার ছোট বাছুরটি আনি ভাব করাইতে চায়,
বিদায়ের দিনে কাঁদিয়া কাঁদিয়া কহিল, "বুজীরে আর
এই পথে যদি আস কভু যেন দেখা হয় একবার!
তোমার জন্যে গাঁথিয়া রাখিব পাকা কুঁচ দিয়ে মালা,
ডোমনী আসিলে কিনিয়া রাখিব তল্লাবাঁশের ডালা।
বেদেনীর কাছ হইতে রাখিব রঙিন পুঁতীর দানা,
সে দানায় তুমি ছবি এঁকো বুজী ফুল লতাপাতা নানা।
বৈশাখ মাসে আম শাখা যবে লোটাবে বোলের ভারে
মাথা খাও মোর, তুমি যদি বুজী নাহি আস এই ধারে।"
টানিয়া টানিয়া আঁকিল সে দুলী আম গাছটির ডাল,
পাকা ফলভারে লুটায়ে প'ড়েছে লইয়া পাতার জাল।

তারি তলে বসি কৃষাণ মেয়েটি গাঁথিছে কুঁচের মালা,
সামনে তাহার লতাফুল-আঁকা বাঁশের রঙিন ডালা।
তারপর তুলী আঁকিল যতনে যেখানে পথের পর,
অজ্ঞান হয়ে প'ড়েছিল সে যে লাগিয়া রবির কর।
জানুর উপরে মাথা রেখে তার, লইয়া গাছের শাখা
সোজন তাহারে করেছিল হাওয়া, এ ছবি হইল আঁকা।

সোতের সেহলা ভাবিয়াছে তারা উদ্দেশ হীন হায়,
বনের পশুর সাথে ঘুমায়েছে, কভু মানুষের গাঁয়
গোদার গেরামে ঘাট-কোতয়াল রূপেতে মজিয়া তার—
চোখ ঘুরাইয়া কি একটি কথা বলেছিল একবার।
সোজন তাহারে কেমন করিয়া শাস্তি যে দিয়েছিল,
দেয়ালের গায়ে ধ'রে ধ'রে তুলী সকলি আঁকিয়া নিল।
তারপর তুলী আঁকিতে বসিল গোড়াই নদীর জলে,
লাল নীল পাল হেলায়ে দোলায়ে দূরদেশী মাঝি চলে।
ঘাটের কেনারে প্রতীক্ষমানা দাঁড়ায়ে একটি মেয়ে,
তু'টি চোখ তার ভরিয়াছে জলে কাঁখের ঘড়ায় চেয়ে।
এ ছবিখানি রেখায় রেখায় তুলীর সারাটি মন,
বরণে বরণে গলাগলি ধরি করে যেন ক্রন্দন।
অন্তর হ'তে ব্যথার দোসর বাহির হইয়া হায়—
তুলীর বুকের যত কথা যেন কহিছে সে নিরালায়।

*　　　*　　　*

এমন সময় তুয়ারে দাঁড়াল পুলিশের লোকজন,
সোজনেরে তারা আনিয়াছে সাথে হাত করি বন্ধন।

দুই

যে পথে পাখিরা যায় গো কুলায়
যে পথে তপন যায় সন্ধ্যায় ;
সে পথে মোদের হবে অভিসার
শেষ তিমির রাতে ;
ওগো সাথী ! মম সাথী,
আমি সেই পথে যাব সাথে ।

—অতুলপ্রসাদ

১৭*

দিনে দিনে খসিয়া পড়িল
রঙিলা দালানের মাটি।
—বাউলের গান

শোন ভাই সকলে কুতূহলে করি নিবেদন,
নমু মুসলমানের দাঙ্গা করিব বর্ণন।
সন তেরশো উনত্রিশে, মাঘ মাসের রাতে,
কাজীর গাঁয়ে পড়ল নমু সড়কী লয়ে হাতে।
মশাল জ্বালি হাজার ঢালী ঘুরিয়ে রামদাও,
জিল্‌কি দেয়া সঙ্গে লয়ে আসল যেন বাও।
মলুদের মফেল ছেড়ে, উঠল তেড়ে যতেক মুসলমান
'আলী আলী' শব্দ করি ভাঙিল আস্‌মান।
লাগল আগুন, জ্বলল দ্বিগুণ জগৎ জোড়া শিখা,
কপালেতে পরছে যেন জাহান্নমের টিকা।
আসল ছুটে, মানুষ জুটে নানান গ্রামের থেকে,
সেই আগুনের তপ্ত শিখা বুকের পাটায় এঁকে।
নায়েব মশায় ছিলেন সদয় যতেক নমুর তরে,
তেলিহাটির পরগণাতে এলেন দাওয়াৎ করে।
মোহনপুর, কেষ্টপুর মাধবদিয়া ছাড়ি,
পঙ্গ পালের মতন নমু ছুটল তাড়াতাড়ি।

* নমু মুসলমানের সাইর।

ঢাকার নবাব, দিলেন জবাব, হাজার মুসলমান
পদ্মা নদী পার হইয়া ঘিরিল আস্‌মান।
এলো কাজেম খুনি, শব্দে শুনি বন্দুকেরি গুলি,
আলীর নামে ডাক ছাড়িয়া মুখেই নিত তুলি।
এলো ছদন মাল, জুতীর কাল বিঁধ্‌ত না যার চামে
সাত আটদিন লড়াই ক'রে গা নাহি তার ঘামে।
এলো বচন মিঞা কোরান লিয়া এছেম আজম পড়ি
ফুক ছাড়িলে হাজার লেঠেল পড়ত গড়াগড়ি।

নমুর মাঝে সকল কাজে আগে যাহার ঠাঁই,
তেলিহাটীর গদাই মাল তুলনা যার নাই!
গদাই মাল, দেয় ফাল আট কাঠা ভূঁই জুড়ে,
আকাশ চিরে বিজলী ছুটে বর্ষা যখন ছুঁড়ে।
এলো রামহাতি, যুদ্ধে মাতি, থাপড় মারে বুকে,
বোশেখ মাসের ঠাটা যেমন গিরীর বুকে ঠুকে।
এলো নিধিরাম যেমন নাম, তেমন তাহার কাম,
বন-সজারুর মতন তাহার সকল গায়ের চাম।
বারুদ-গুলি, মুখে তুলি চিবোয় যেমন মুড়ি,
দশটা কাইজা শেষ করে সে হাতের দিয়ে তুড়ি।
এলো মোহন রায় পুবের বায় মন্ত্র ছুঁড়ি ছুঁড়ি,
যোলশো ডাক-ডাকিনী তার সঙ্গে নাচে ঘুরি।
এমনি করে দিনের পরে যতই দিবস চলে,
নমু মুসলমান মাতিল রণের কোলাহলে,
গ্রাম জ্বলিল, ঘর পুড়িল, দেশ হ'ল ছারখার,
কিবা নমু মুসলমানের হুঁশ নাহিক কার।

এই এলোরে, ওই গেলরে, ধর মার মার ভাই,
জাহান্নমের আগুন-দোলা দুলিয়ে দোল খাই।
সকল মানুষ হদ্দ বেহুঁস পতঙ্গেরি মত—
আপন হাতে জ্বালল আগুন আপনি হ'তে হত।
মায়ের বুকের খোকন দুধের, আছাড়ি তায় মারি—
করছে সবে পথে ঘাটে লাইঠেলি নাম জারি।

'হায় হাহাকার উঠল এবার ভরি সকল দেশ,'
রোজ কেয়ামত তক্ যেন এর হবেই নাক শেষ।
শ্মশানঘাটায়, রাত্র দিবায় চিতার পরে চিতা—
সাজিয়ে এবার কতই মাতা কাঁদছে ব্যথায় ভীতা।
যেথায় চাহি মানুষ নাহি, শুধুই কবর-খানা,
শিয়াল-শকুন-গৃধিনীরা ফিরছে দিয়ে হানা।
দিনের পরে দিন গোজরে, নিবল চিতার জ্বালা,
কবর পরে দূর্ব্বা ঘাসে মেলল পাতার ডালা।
জনম-দুখী পোড়ারমুখী রইল বেঁচে যারা,
তাদের বুকের কবরে ঘাস মেলল নাক চারা।
বাতাস লেগে চিতার থেকে উড়ল শুধু ছাই,
বুকের চিতায় দ্বিগুণ আগুন জ্বালিয়ে দিল তাই।

নায়েব মশায় বড়ই সদয়, মূর্খ নমুর তরে—
হুকুমে তাঁর হাট বসিল শিমুলতলীর পরে।

১৮

ইঙ্গিলির ঘরের ভিতর, মরি কি আজব লহর ;
তারেতে চলছে খবর, কি চমৎকার নীলে ?
বালাখানা জলছে বাতি আলো করছে রংমহল।
—বাউল গান

খবর-খবর—কিসের খবর—চলতি খবর—বলতি খবর
উড়ো খবর উড়ছে বায়ে, শব্দ তাহার হচ্ছে জবর।
কানে কানে কান-থাকতে, চোখ-টেপাতে, ভ্রূ-ঘোরাতে—
ঘড়ি ত্বড়ি চলছে খবর, মন গড়াতে মন ভাঙাতে।
পিছন দিয়ে, সামনে দিয়ে, এখান দিয়ে, ওখান দিয়ে—
কেউ চলিছে খবর দিয়ে, কেউ চলিছে খবর নিয়ে।
মিথ্যে খবর, সত্যি খবর হাটে বাটে চ'লছে নিতি,
কখন দিয়ে সুখের পরশ, কখন গেয়ে দুখের গীতি।
চলছে খবর অন্দরেতে, চলছে খবর বহির্বাটি,
ঘুঙুর পরা পায়ের দাগে রেখায় রেখায় আঁখর কাটি
আসছে খবর—যাচ্ছে খবর পথ চলিবার ঠেকরা-গাড়ী,
নানান কাজে ব্যস্ত সবে, কে করে কার খবরদারী।

শুনেছিলাম নায়েব মশায় জেলায় যেয়ে নালিশ করি—
নারী-হরণ মোকর্দ্দমায় সোজনেরে দিলেন ধরি।
তারপরে তার বিচার হ'ল, অত শত কেইবা শোনে,
সাতটি বছর মেয়াদ তাহার কাটল নাকি জেলের কোণে।

মেয়াদ হ'তে খালাস পেয়ে শুনল যখন সবার মুখে,
নতুন বিয়ের বরকে নিয়ে ছুলীর দিবস কাটছে সুখে ;
মনের দুখে তখন নাকি ফিরল না সে আপন গাঁয়ে
দেশান্তরী ছুটল কোথা দূরদেশী এক বেদের নায়ে।
কেউ বা বলে, এসব কথা সত্য বলে হয় না মনে,
যা হোক একটা হবেই কিছু, আজকে ওসব কেউবা গণে।

খবর-খবর-নিত্য নতুন উড়ছে পথে হাউই বাজী,
ঐন্দ্রজালীক জাল টানিছে, কাল যা দেখি নাই তা আজি।
নমু মুসলমানের পাড়া শিমুলতলীর গেরাম ভরি—
জমীদারের হাট বসেছে নায়েব ম'শার সুনাম ধরি।
নমু মুসলমান কোথা আজ ? শিমুলতলীর কাজেম খুনী,
কাইজাতে আর তাহার মুখের উঁচুগলার ডাক না শুনি।
মদন কুলু রামদা বেচে জমীদারের খাজনা দেছে,
সাধুর পোলার নিমাইপালের জুতীর কালের ধার যে গেছে।

আজকে কেহ ভয় করোনা নমু মুসলমানের নামে,
সময় কাটে এখন তাদের পদধুলি লওয়ার কামে।

১৯

হক্কারে খাইলাম

ঝক্কারে খাইলাম

পর্ব্বতের মাথায় লাথি

হাতির কান্ধে রামদা ধারাই ;

আমি বাঙ্গারামের নাতি।

—হাডুডু খেলার ছড়া

কাজীর চকের মধ্যখানে ছোট্ট বহে বিল
আরসীতে তার যায় যে দেখা সকল গাঁয়ের দিল্।
ওধার দিয়ে পথটি গেছে শিমুলতলীর হাটে,
উত্তরীয় পরিয়ে দিয়ে ফসল ভরা মাঠে।
ওধারে পথ উঁচুনীচু গরুর পায়ের খুরে,
বিক্ষত সে কাঁদছে যেন ধূলার নিশাস ছুঁড়ে।
সেখান দিয়ে হাটের পথে চ'লছে বুড়ো একা,
ললাটে তার পষ্ট আঁকা হাজার শোকের রেখা ;
খনিক চলে, আবার বসে জীর্ণ দেহ তার,
আপনাকেই বইতে যেন সাধ্য নাহি আর।

ওপার দিয়ে আরেক বুড়ো চ'লছে তারি মত,
আশিবছর কুড়িয়েছে সে দুঃখ সুখের ক্ষত।

“ওধার দিয়ে যায় কেডা ও ?” শুধায় ডেকে ডেকে ;
“শিমুলতলীর গদাই মোড়ল।” শব্দ আসে হেঁকে।
“কে কথা কয় ?” “ছমির লেঠেল।—তোমার মনে নাই ?
শিমুলতলী জড়িয়ে ছিলাম আমরা যে ক ভাই।”
“ছমির লেঠেল ? ভালই হ’ল, কদিন বা আর আছে,
ইচ্ছে ছিল, দু’চার কথা বলব তোমার কাছে।
মাথার উপর ঘূরছে শমন—ভালই হ’ল ভাই
জন্মের শোধ দু’চার কথা তোমায় বলে যাই।
হয়ত মোরে দিচ্ছে সবে অনেক অভিশাপ,
আমি কি ভাই নিজের বুকে লইনি বহু তাপ ?
আপন হাতে সাতটি পোলায় চিতায় দেছি তুলে,
তবু কি ভাই মোর অপরাধ যাবে না কেউ ভুলে ?”

“ওসব কথা তু’লনা আর, সকল মোরা জানি,
কি হবে আর ক্ষত স্থানে নুনের ছিটা হানি।”

“না ভাই আমি শোধ লইব—শোধ লইব আজ—
যে পরাল আজ আমাদের এমন কাঙাল সাজ।
শিমুলতলীর গদাই মোড়ল, ডাক শুনিয়া যার,
সাতশ নমু যখন তখন মিলত এসে সার।
আজ কোথা সে সাতশ নমু ?—সোনার শিমুলতলী,
জমীদারের বাজার সেথা ব’সেছে গলি গলি।”
“কি প্রতিশোধ লইবে মোড়ল ? আর ত কেহ নাই,
দেশজোড়া আজ কবর গ’ড়ে ঘুমিয়েছে সব ভাই।

শিমুলতলীর মোল্লা বাড়ী—ভিটায় ভিটায় ঘর,
দলিজাতে হাট মিলিত সারাটা দিন ভর।
সাতটি ঘরে সাতটি ডোলের গলায় গলা ধরি
ফসল যাদের উঠান ভরি ক'রত গড়াগড়ি ;
তাদের বংশে জ্বালাতে বাতি কেউ নাহি আর বাকি,
কাজীর গাঁয়ের গোরস্থানে এলেম তাদের রাখি।
শোধ লবে আজ কার পরে ভাই ? ছমির লেঠেল আর
নমু মুসলমানের হ'য়ে লয়না লাঠি তার।
আজ সে হাতে নাই শকতি কবর-খানায় ব'সে—
কেয়ামতের কদিন বাকি দেখি যে আঁক ক'সে।"

"কি প্রতিশোধ লইবে মোড়ল ?—শিমুলতলী গাঁয়
নমু মুসলমানের পাড়া বুনো তরুর ছায়,
গাজীর গানে নাচন নাচি, গাজন তলায় গাহি,
মাঠে মাঠে হাল বাহিয়া রায় দীঘিতে নাহি ;
দিবসগুলি কাটত যাদের উৎসবেরই প্রায়,
নমু মুসলমানের কেহ আর নাহি সে গাঁয়।
আজকে তারা চিতায় চিতায় গহন মাটির গোরে—
ঘুমিয়ে আছে, হাজার ডাকেও শব্দ নাহি করে।"

"শোধ নেব ভাই—শোধ নেব এর, তারি প্রতীক্ষায়
আজও আছি বাঁচিয়ে এই জীর্ণ জীবনটায়।
যার আদেশে আজ আমাদের এমন দশা ভাই,
তাহার গায়ে খড় কুটারও আঁচড় লাগে নাই।"

"জানি মোড়ল—সবই জানি, লিখন লেখা ভালে—
পারেনা কেউ খণ্ডাতে তা যখন ধরে কালে।"

"না ভাই ইহার শোধ লইব, সারা জনম ভরি
দুঃখের দেশে ঘুরায় যারা মোদের এমন করি ;
তারা যদি রয় বেঁচে আজ, হয়ত দু'দিন গেলে,
নমু মুসলমানের বিবাদ আবার দিবে জ্বেলে।
আজকে তাদের একজনেরে সঙ্গে করে লয়ে,
মরতে পারি, সেই সে মরণ হাসবে গরব হ'য়ে।
রামনগরের নায়েব মশায়, শয়তানেরে আজ,
ভবপারে পাঠিয়ে তবে পরব মরণ সাজ।"
"কি কথা আজ ব'লছ মোড়ল বুঝতে নাহি পারি,
রামনগরের নায়েব, সে ত নমুর সুহৃদ ভারি।"

"নমুর সুহৃদ. ছমির লেঠেল, প্রণাম নিয়ে যারা
কৃপা করেন বুঝবো আজো নমুর সুহৃদ তারা ?
মোদের যারা কুকুর-বিড়াল—তারও অধম ক'রে,
পিঠের পরে হান্‌ছে লাঠি সারা জনম ভরে ;
মোদের বুকের পাঁজর ভেঙ্গে গ'ড়ছে ইমারত,
মাথার উপর টানছে যারা জমীদারের রথ ;
সামনে যাদের গেলে পরেই মান দেখাতে হয়,
নমু মুসলমানের সুহৃদ তারা কখন নয়।
নমুর সুহৃদ হয় যদি কেউ, মাঠেতে হাল বাহি,
চৈত্র-রোদের জ্বালায় জ্বলে ঘামের জলে নাহি—

ঝড়-বাদলের, দুঃখে সুখে গাঁয়ের ছোট ঘরে,
নমুর মতই বাস করে যে সারা জনম ভরে ;
— তারা গাঁয়ের হাজার চাষী জনম-দুখীর দল,
মাথায় তাদের সমান বহে শাওন মাসের জল।
জমীদারের অত্যাচারও সমান মাথায় বহে
দুঃখী তারা নয়ক নমু, মুসলমানও নহে।
কাইজা ক'রে কি ফল পেলাম, নমু মুসলমান—
কেউ ঘুমাল গোরে, কেহ চিতায় দিল প্রাণ
তোমার চোখে, আমার চোখে সমান জলের ধারা,
শিমুলতলী হাট বসায়ে ফূর্ত্তি করে তারা।
চাই প্রতিশোধ—চাই প্রতিকার—বুকের হাহাকার,
নইলে যে আর থামবে নাক গেলেও মরণ পার।"

মালকোছাতে কাপড় প'রে ছমির লেঠেল কয়,
"নমু মুসলমানের আজি নতুন পরিচয়।
দেশ জুড়িয়া কবর খুঁড়ি শুইয়েছি সব ভাই,
শ্মশান ঘাটায় নিবছে চিতা—বক্ষে নেবে নাই।
তীব্র তাহার অনল-জ্বালা অঙ্গে মেখে তবে,
দু ভাই এস লাফিয়ে পড়ি যা' হবার তা' হবে।
সাতটি পোলা চিতায় শুয়ে হাজার নমু গাঁর,
এত যে ডাক ডাকছি তবু জবাব নাহি কার'।
দু'তীর দিয়ে চলল দু'জন, সাঁঝের খুনী রবি
আঁধার পায়ে দ'লছিল সে দিনের যত ছবি।

*　　　　*　　　　*

পরের দিনে সকাল বেলা দেখল পথিক জন,
এপার বিলের কবর বাঁধা ওপার চিতা কোন্।
খবর—খবর—কিসের খবর—গুজব শুনি গাঁয়,
রামনগরের নায়েব ম'শার খোঁজ না পাওয়া যায়।
ক'দিন পরে দেখল সবে বিলের ধারে খুঁড়ে,
নায়েব ম'শার আধেক দেহ ঘুমিয়ে কবর জুড়ে।

২০

আগে জানি নাই পিরীতি পরাণ যাবেরে,
আগে জানি নাই পিরীতি এমন হবেরে।

আগে না জেনে পিছে না শুনে প্রেম যে-জন করে,
ঘসীর অনল তুষের ধুমা সদাই জ্বইলা জ্বইলা উঠেরে ॥
—আমি আগে জানি নাই।
পিরীতির আটন পিরীতির ছাটন পিরীতির দু'খানা চাল,
পিরীতির ঘরে কবাট দিয়ে আমি রইব কত কালরে ;
—আমি আগে জানি নাই।
আঙুল কাটিয়া কলম বানাই চক্ষের জল কালি,
পাঁজর কাটিয়া লেখন লিখিয়া পাঠাই বন্ধুর বাড়ীরে ;
—আমি আগে জানি নাই।
—মুর্শীদা গান

মধুমতী নদী দিয়া

বেদের বহর ভাসিয়া চ'লেছে কূলে ঢেউ আছাড়িয়া।
জলের উপরে ভাসাইয়া তারা ঘরবাড়ী সংসার,
নিজেরাও আজ ভাসিয়া চ'লেছে সঙ্গ লইয়া তার।
মাটির ছেলেরা অভিমান করে ছাড়িয়া মায়ের কোল,
নাম-হীন কত নদী তরঙ্গে ফিরিছে খাইয়া দোল।
দু'পাশে বাড়ায়ে বাঁকা তট-বাহু সাথে সাথে মাটি ধায়,
চঞ্চল ছেলে আজিও তাহারে ধরা নাহি দিল হায়।
কত বন-পথ সুশীতল-ছায়া, ফুল ফল ভরা গ্রাম,
শস্যের খেত আলপনা আঁকি ডাকে তারে অবিরাম।
কত খল-দীঘি, গাজনের হাট, রাঙা মাটি পথে ওড়ে,
কারো মোহে ওরা ফিরিয়া এলোনা আবার মাটির ঘরে।

জলের উপরে ভাসায়ে উহারা ডিঙ্গী নায়ের পাড়া,
নদীতে নদীতে ঘুরিয়া ফিরিছে সীমাহীন গতিধারা।
তারি সাথে সাথে ভাসিয়া চ'লেছে প্রেম, ভালবাসা, মায়া,
চ'লেছে ভাসিয়া সোহাগ, আদর ধরিয়া ওদের ছায়া।
—জলের উপরে ভাসিয়া চ'লেছে কোলাহল, মারামারি,
ত্যাগের মহিমা, পুণ্যের জয় সঙ্গে চ'লেছে তারি।

সামনের নায়ে বউটি দাঁড়ায়ে হাল ঘুরাইছে জোরে,
রঙিন পালের বাদাম তাহার বাতাসে গিয়াছে ভ'রে।
ছইএর নীচে স্বামী ব'সে ব'সে লাঠিতে তুলিছে ফুল,
মুখেতে আসিয়া উড়িছে তাহার মাথার বাব্‌রী চুল।
ও নায়ের মাঝে বউটিরে ধ'রে মারিতেছে তার পতি,
পাশের নায়েতে তাস খেলাইছে সুখে দুই দম্পতি।
এ নায়ে বেধেছে কুরুক্ষেত্র বউশাশুড়ীর রণে,
ও নায়ে স্বামীটি কানে কানে কথা কহিছে জায়ার সনে।
ডা'ক ডাকিতেছে, ঘুঘু ডাকিতেছে, কোড়া করিতেছে রব,
হাট যেন জলে ভাসিয়া চ'লেছে মিলি কোলাহল সব।
জলের উপরে কেবা একখান নতুন জগত গ'ড়ে,
টানিয়া ফিরিছে যেথায় সেথায় মনের খুশীর ভরে।

কোন কোন নায়ে রোদে শুখাইছে ছেঁড়া কাঁথা কয়খানা,
আর কোন নায়ে সাড়ী উড়িতেছে বরণ দোলায়ে নানা।
ও নাও হইতে শুঁটকি মাছের গন্ধ আসিছে ভাসি,
এ নায়ের বধূ সুন্দাও মেথি বাটিতেছে হাসি হাসি।

কোনখানে ওরা স্থির নাহি রহে, জ্বালাতে সন্ধ্যাদীপ,
এক ঘাট হ'তে আর ঘাটে যেয়ে দোলায় সোণার টীপ।
এদের গাঁয়ের কোন নাম নাই, চারি সীমা নাহি তার,
উপরে আকাশ, নীচে জলধারা, শেষ নাহি কোথা কা'র।
পড়শী ওদের সূর্য্য, তারকা, গ্রহ ও চন্দ্র আদি,
তাহাদের সাথে ভাব ক'রে ওরা চলিয়াছে দল বাঁধি ;
জলের হাঙর—জলের কুমীর—জলের মাছের সনে,
রাতের বেলায় ঘুমায় উহারা ডিঙ্গী-নায়ের কোণে।

বেদের বহর ভাসিয়া চলেছে মধুমতী নদী দিয়া,
বেলোয়ারী চুড়ী, রঙিন খেলনা, চিনের সিঁদুর নিয়া ;
ময়ূরের পাখা, ঝিনুকের মতি, নানান পুঁতির মালা,
তরীতে তরীতে সাজান র'য়েছে, ভরিয়া বেদের ডালা।
নায়ে নায়ে ডাকে মোরগ-মুরগী যত পাখী পোষ-মানা,
শিকারী কুকুর রহিয়াছে বাঁধা আর ছাগলের ছানা।
এ নায়ে কাঁদিছে শিশু মার কোলে—ও নায়ে চালার তলে,
গুটি তিনচার ছেলে মেয়ে মিলি খেলা করে কুতূহলে।

বেদের বহর ভাসিয়া চলেছে, ছেলেরা দাঁড়ায়ে তীরে,
অবাক হইয়া চাহিয়া দেখিছে জলের এ ধরণীরে।
হাত বাড়াইয়া কেহ বা ডাকিছে—কেহ বা ছড়ার সুরে,
দুই-খানি তীর মুখর করিয়া নাচিতেছে ঘুরে ঘুরে।

চলিল বেদের নাও,
কাজল কুঠীর বন্দর ছাড়ি ধরিল উজানী গাঁও।
গোদাগাড়ী তারা পারাইয়া গেল, পারাইল বউঘাটা,
লোহাজুড়ি গাঁও দক্ষিণে ফেলি আসিল দরমাহাটা।
তারপর আসি নাও লাগাইল উড়ানখালির চরে,
রাতের আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে তখন মাথার 'পরে।

ধীরে অতি ধীরে প্রতি নাও হ'তে নিবিল প্রদীপ গুলি,
মৃদু হ'তে আরো মৃদুতর হ'ল কোলাহল ঘুমে ঢুলি।
কাঁচা বয়সের বেদে-বেদেনীর ফিস্ ফিস্ কথা কওয়া,
এ নায়ে ও নায়ে ঘুরিয়া ঘুরিয়া শুনিছে রাতের হাওয়া।
তাহাও এখন থামিয়া গিয়াছে, চাঁদের কল্‌সী ভরি,
জোছনার জল গড়ায়ে পড়িছে সকল ধরণী 'পরি।
আকাশের পটে এখানে সেখানে আবছা মেঘের রাশি,
চাঁদের আলোরে মাজিয়া মাজিয়া চ'লেছে বাতাসে ভাসি।
দূর গাঁও হ'তে রহিয়া রহিয়া ডাকে পিউ, পিউ কাঁহা,
যোজন যোজন আকাশ ধরায় রচিয়া সুরের রাহা।

এমন সময় বেদে-নাও হ'তে বাজিয়া বাঁশের বাঁশী,
সারা বালুচরে গড়াগড়ি দিয়ে বাতাসে চলিল ভাসি ;
কতক তাহার নদীতে লুটাল, কতক বাতাস বেয়ে,
জোছনার রথে সোয়ার হইয়া মেঘেতে লাগিল যেয়ে।
সেই সুর যেন সারে জাহানের দুঃসহ ব্যথা, ভার,
খোদার আরস কুরছি ধরিয়া কেঁদে ফেরে বারবার।

সেই বাঁশী বাজে, নিঠুর আমারে সোতের সেহলা করি,
আর কতদূরে ভাসাইয়া নিবে ভাটীয়াল নদী ধরি।
যাহার তরেতে বাদীয়ার ঝাপী ব'য়ে ফিরি দেশে দেশে,
আজো সে আমারে নারে দেখা দিল, কথা না কহিল এসে।
উড়িয়া যাওরে বনের পঙ্খী—অনেক দূরেতে যাও,
অভাগিনী দুলী কোন্ দেশে থাকে দেখিতে কি তারে পাও ?
যদি দেখে থাক, কহিও—এখনো মরেনি এ হতভাগা,
আজো গাঙে গাঙে ভেসে ফেরে সে যে লইয়া বুকের দাগা।
উঞ্চল ডালে থাকরে পঙ্খী—নজর বহুৎ দূর,
হয়ত বা তুমি জান সন্ধান মোর প্রাণবন্ধুর ।
যদি জান তবে এনে দাও তারে দেরীর সময় নাই,
মাটির প্রদীপ করে নিবু নিবু, বড় ভয় লাগে তাই।
জনমের দেখা দেখিব তাহারে, তারপর কেহ আর,
সোজন বলিয়া কে ছিল কোথায় জানিবে না সমাচার।
আমার বুকের মালারে পঙ্খী, দোলে বেগানার গলে,
কি আশায় তবে বাঁচিয়া থাকিব, মোরে যাও তুমি ব'লে।

ভাটী বেয়ে তুমি যাও ওরে নদী। শুনি' ভাটীয়াল সুর,
হয়ত বা তুমি জান সন্ধান মোর প্রাণবন্ধুর।
মোরে তবে নদী সেই দেশে আজ নিয়ে যাও ভাসাইয়া,
জীবনের শেষ নিঃশ্বাস সব তারি কূল আঁকড়িয়া।
তাহারি কাঁখের কলসীতে শুনি জল ভরণের গান,
বড় সুখে আমি করিবরে নদী জীবনের অবসান।
যেই কূল তুমি ভাঙিছরে নদী, সে কূলেতে কর বাস,
তোমার নিকটে শিখেছি বন্ধু এই রীতি বারমাস।

'আগে যদি আমি জানিতাম নদী পিরীতের এত জ্বালা,
নারে যাইতাম কদম্ব-তলে, নারে গাঁথিতাম মালা।'
ঘসীর অনল রহিয়া রহিয়া ধিকি ধিকি জ্বলে ওঠে,
দেহ পু'ড়ে যায়, হারে অভাগার পরান নাহিক ছোটে।
'নদীরে তোমার বুকে ঢেউ দিলে কূলেতে আঘাত লাগে ;
বুকের ব্যথার দোসর নাহিক আপনারে শুধু দাগে।
'বন পু'ড়ে গেলে, সব লোকে দেখে, মনের অনল যার
দ্বিগুণ জ্বলিছে, তবু কেহ তার জানেনাক সমাচার।'
এমনি করিয়া বাঁশীর সুরেতে আকাশ বাতাস বুঝি
বিনায়ে বিনায়ে অঝোরে কাঁদিছে আপন ব্যথারে খুঁজি।
যোজন জুড়িয়া সাদা বালুচর,—জোছনা কাফন গায়ে,
ধুলার নিশাসে কাঁপিয়া উঠিছে শেষ রাত্রের বায়ে।

২৭

আমার মনের অনল নেবে না।
ও অনল রয়া রয়া জ্বলে রে।
ও অনল কি দিয়া নিবাব রে,
আমার মনের অনল নেবে না।
বনের হরিণ বলে আমি কার বা ধার ধারী,
আপনার মাংস দিয়া জগৎ করলাম বৈরী রে ;
আমার মনের অনল নেবে না।
—মুর্শীদা গান

দুলালীর কথা সুধা'য়োনা কেহ,
সোতের সেহলা ভাসিয়া নদীর ধারে,
কোন্ পথদিয়ে কোথায় গিয়াছে,
আজিকে সে সব ভুলে যেতে দাও তারে।
এই ধরণীর বক্ষ জুড়িয়া
সহস্র সুখ, সহস্র ব্যথা লয়ে,
কত লোক আছে তাদের খবর
জানিতে কোথায় কে যায় ব্যাকুল হ'য়ে।
নাম-নাহি-জানি কত ফুল পাখি,
তাদের জীবনে অভিনব সুখ দুখ,
ওসব লইয়া মাথা ঘামাবার
অবসর আছে কার কতটুকু।

আকাশ হইতে কত তারা খসে,
কত তারা হাসে, তেমনি একটি তারা
—সবার সাম্‌নে, তবু যেন কেহ
না জানিতে পারে তাহার পথের ধারা।
জীবন-নদীর বাঁকে বাঁকে আছে
সহস্র সুখ, সহস্র ব্যথা-গান,
সে সব আজিকে স্মরণ করায়ে—
কাঁদায়ো না তার ক্ষত-বিক্ষত প্রাণ।

এ জীবনে সে যে অনেক স'য়েছে—
মাটির ধরার মানুষে যত না পারে,
তার চেয়ে আরো সহস্র গুণ
তীব্র ব্যথারে সহিতে হ'য়েছে তারে।
আঁচলের তলে আগুন লুকায়ে,
গহনায় তার জড়াইয়া কাল-সাপ,
সীথার সিঁদুরে চিতা জ্বালাইয়া
সহিয়াছে সে যে খর নিদাঘের তাপ!
এ সব তারে ভুলে যেতে দাও
বড় সে ক্লান্ত—বড় সে শ্রান্ত আজি;
এসো ঘুম এসো—কুহেলী রাতের
কেশে জড়াইয়া সোনার স্বপনে সাজি।
এসো ঘুম—এসো—সন্তাপ-হরা—
—এসো—এসো তুমি ভুবনমোহন ভুল,
তুমি লহ এই মন্দভাগিনী
পল্লী-বালার, জীবনের শেষ ফুল।

দিন-রজনীর খেয়া তরী বাহি'
আসে নিতি নিতি নব নব হাসি গান,
সন্ধ্যা-সকাল আসে দু'টি বোন
রঙের নদীতে হাসিয়া করিতে স্নান।
তারা যেন তারে ভুলাইয়া যায়—
যেন তাহাদের আসা-যাওয়া পথ-ধারে
সে হতভাগিনী লুকাইতে পারে
ক্ষত-বিক্ষত তাহার অতীতটারে।
—তবু অতীত—দুখের অতীত,
পথে যেতে যেতে বারে বারে ফিরে চায়,
জীবনের শত হাসি গান যেন
কার ছোঁয়া লাগি কিসে কি হইয়া যায়।

তবু আজ দুলী সব ভুলে যাবে—
বন-ছায়া ঘেরা শিমুলতলীর গ্রাম,
এত আদরের জনক-জননী,
জীবনেও সে যে লবে না কাহারো নাম।
ভুলে যাবে দুলী শৈশব-খেলা,
ভুলে যাবে কোন্ কুমারনদীর তীরে,
কপোত কপোতী নীড় বেঁধে ছিল
পাথ্‌নার তলে এ উহারে ল'য়ে ঘিরে,
ভুলে যাবে দুলী থানার পুলিশ,
সদর কাছারী, হাকিমের কাছে হায়,
কোন্ কথা দুলী বলিতে যাইয়া
প'ড়ে গিয়েছিল নিদারুণ মূর্চ্ছায়।

সোজনের সেই ফাটক হইল,
এক শুভদিনে শিমুলতলীর গাঁয়,
আবার বাজিল বিয়ের বাজনা,
বাঁধিল তাহারে হাতে পায়ে গহনায়।
এই কাহিনীর সে যেন কেহ না,
একা গাঁর পথে একতারা লয়ে করে,
বৈরাগিনী কে গান গেয়ে গেয়ে
কবে চ'লে গেছে আব্‌ছা সে মনে পড়ে।
তাহাও আজিকে ভুলে যাবে দুলী,
আর সে সোজন,—ভগবান—ভগবান—
মাথায় তার ভাঙিয়া পড়ুক
খর বাজ-ভরা সুদূরের আসমান।

আহারে দারুণ দুখের বন্ধু,
কি রকম দোষে অভাগী দুলীর লাগি,
এত যে কাঁদন কাঁদিতেছ তুমি
স্বেচ্ছায় হ'য়ে আমার ব্যথার ভাগী।
আগে যদি আমি জানিতাম সখা
পিরীতির গাছে শুধু ফোটে কাঁটা-ফুল,
জনম না হ'তে আপনার হাতে
কাটিতাম তারে উপাড়িয়া ডাল-মূল।
কোন্ মা আমারে গর্ভে ধরিল
শিশুকালে যদি নুন্ তুলে দিত মুখে,
এ অভাগিনীর করমের দোষে
আর কাহারেও কাঁদিতে হ'ত না দুখে।

নিদারুণ বিধি! তোমার কলমে
এই ছিল কালি, নি-দুখী এ বালিকারে,
কি সুখের লাগি দারুণ দুখের
সায়রে ভাসায়ে ডুবাইছ বারে বারে।
কোন্ সে পাখীর বাচ্চাগুলিরে
এনেছিল দুলী মার কোল খালি করি,
তারি অভিশাপ আজি কি তাহার
নামিয়া আসিছে সারাটি জনম ভরি।
কার কলিজায় দিতেছে সে দাগ
তারি ছোঁয়া লাগি দুলীর হিয়ার কোণে,
জ্বলে ধিকি ধিকি রাবণের চিতা
দহিয়া তাহারে নিশি-দিন অকারণে।

কি দোষ পাইয়া নিদারুণ বিধি
দুলীর কপালে লিখিলে এমন লেখা,
তুমি কি কখনো এমন বেদনা
পেয়েছে জীবনে শুধাতাম পেলে দেখা।
বন-হরিণীরে বধিলে পরাণে
নিদারুণ ব্যাধ! যে বিষের হানি শর,
তুমি কি জেনেছ সে বিষ ব্যথায়
কি করিয়া কাঁদে হরিণীর অন্তর?
তুমি ত গ'ড়েছ নানা জাত ভবে
গড়িয়াছ সেথা সমাজের ব্যবধান,
কেন এ মনের নাহি জাতিভেদ
একের লাগিয়া কাঁদে অপরের প্রাণ?

না! না! দুলী আর এই সব কথা,
ভুলেও কখনো আনিবে না তার মুখে,
সিঁথায় তাহার জ্বলিছে সিঁদুর,
দু গাছি কাঁকন দুলিছে দু হাতে সুখে।
চন্দ্রের মত সোয়ামীর খ্যাতি,
বুক ভরা তার আকাশের ভালবাসা,
বাব্‌রী ঘুরায়ে দাঁড়ায় যখন,
স্বর্গে তাহারে দেবেরাও করে আশা।
গোলাভরা ধান, উঠানে তাহার,
গড়াগড়ি করি' ফসলেরা বারোমাস,
পূজা পরবের গলাগলি ধরি
কেহ যায় আর কেহ আসি লয় বাস্‌।
ইহাদের মাঝে দুলীও তাহার
নিপুণ হাতের সেবার প্রতিমা গড়ি,
সারাটি জীবন নিজেরে বিলায়ে,
বিক্ষত তার অতীতেরে লবে ভরি।

২২

ও তুই আর কত দুখ
দিবিরে নিঠুর আমারে
বোবায় যেমন স্বপ্ন দেখে
মনের কথা মনে রাখেরে
সেই দশা আমার রে।
—মুর্শীদা গান

প্রভাত না হ'তে সারা গাঁওখানি
বিল-বিল ক'রে ভরিল বেদের দলে,
বেলোয়ারী চুড়ি চিনের সিঁদুর,
রঙিন খেল্‌না হাঁকিয়া হাঁকিয়া চলে।
ছোট ছোট ছেলে আর যত মেয়ে,
আগে পিছে ধায় আড়আড়ি করি' ডাকে
এ বলে এ বাড়ী, সে বলে ও বাড়ী,
ঘিরিয়াছে যেন মধুর-মাছির চাকে।
কেউ কিনিয়াছে নূতন ঝাঁজর,
সবারে দেখায়ে গুমরে ফেলায় পা,
কাঁচা পিতলের নোলক পরিয়া,
ছোট মেয়েটির সোহাগ যে ধরে না।
দিদির আঁচল জড়ায়ে ধরিয়া
ছোট ভাই তার কাঁদিয়া কাটিয়া কয়,
"তুই চুড়ি নিলি আর মোর হাত
খালি রবে বুঝি ? কক্ষণো হবে নয়।"

"বেটা ছেলে বুঝি চুড়ি পরে কেউ ?
তার চেয়ে আয় ডালিমের ফুল ছিঁড়ে,
কাঁচা গাব ছেঁচে আঠা জড়াইয়া
ঘরে ব'সে তোর সাজাই কপালটিরে।"
দস্যি ছেলে সে মানে না বারণ
বেদেনীরে দিয়ে তিন তিন সের ধান,
কি ছাতার এক টিন দিয়ে গড়া
বাঁশী কিনে তার রাখিতে যে হয় মান।

মেঝো বউ আজ গুমর ক'রেছে
শাশুড়ী কিনেছে ছোট ননদের চুড়ি,
বড় বউ ডালে ফোড়ং যে দিতে
মিছেমিছি দেয় লঙ্কা-মরিচ ছুঁড়ি।
সেজো বউ তার হাতের কাঁকন
ভাঙিয়া ফেলেছে ঝাড়িতে ঝাড়িতে ধান,
মন কসাকসি, দর কসাকসি
করিয়া বৃদ্ধা শাশুড়ী যে লবে জান।

এমনি করিয়া পাড়ায় পাড়ায়
মিলন-কলহ জাগাইয়া ঘরে ঘরে,
চলে পথে পথে বেদে দলে দলে
কোলাহলে গাঁও ওলট পালট ক'রে।

ইলি মিলি কিলি কথা কয় তারা
রঙ্-বেরঙের বসন উড়ায়ে বায়ে,
ইন্দ্র জেলের জালখানি যেন
বেয়ে যায় তারা গাঁও হতে আর গাঁয়ে।
এ বাড়ী—ও বাড়ী—সে বাড়ী ছাড়িতে
হেলা ভরে তারা ছড়াইয়া যেন চলে,
হাতে হাতে চুড়ি, কপালে সিঁদুর,
কানে কানে দুল, পুঁতীর মালা যে গলে।
নাকে নাক-ছাবি, পায়েতে ঝাঁজর—
ঘরে ঘরে যেন জাগায়ে মহোৎসব,
গ্রাম- পথখানি রঙিন করিয়া
চলে হেলে দুলে বেদে-বেদেনীরা সব।

"দুপুর বেলায় কে এলো বাদিয়া
দুপুরের রোদে নাহিয়া ঘামের জলে,
ননদী লো, তারে ডেকে নিয়ে আয়,
বসিবারে বল কদম গাছের তলে।"
"কদমের ডাল ফোটা ফুল ভারে
হেলিয়া প'ড়েছে সারাটি হালট ভ'রে,"
"ননদী লো, তারে ডেকে নিয়ে আয়,
বসিবারে বল বড় মণ্ডপ ঘরে।"
"মণ্ডপ ঘরে মস্ত যে মেঝে
এখানে সেখানে ইঁদুরে তুলেছে মাটি,"
"ননদী লো, তারে বসিবারে বল
উঠানের ধারে বিছায়ে শীতলপাটী।

শোন শোন ওহে নতুন বাদিয়া,
রঙীন ঝাঁপির ঢাকনি খুলিয়া দাও,
দেখাও দেখাও মনের মতন
সুতা সিন্দুর তুমি কি আনিয়াছাও।
দেশাল সিঁদুর চাই নাক' আমি
কৌটায় ভরা চিনের সিঁদুর চাই,
দেশাল সিঁদুর খস্ খস্ করে,
সিঁথায় পরিয়া কোন সুখ নাহি পাই।
দেশাল সোন্দা নাহি চাহি আমি
গায়ে মাখিবার দেশাল মেথি না চাহি,
দেশাল সোন্দা মেখে মেখে আমি
গরম ছুটিয়া ঘাম-জলে অবগাহি।"
"তোমার লাগিয়া এনেছি কন্যা,
রাম-লক্ষ্মণ দু গাছি হাতের শাঁখা,
চীন দেশ হ'তে এনেছি সিঁদুর
তোমারি রঙিন মুখের মমতা মাখা।"
"কি দাম তোমার রাম-লক্ষ্মণ
শঙ্খের লাগে, সিঁদুরে কি দাম লাগে ?
বিগানা দেশের নতুন বাদিয়া
সত্য করিয়া কহ গো আমায় আগে।"

"আমার শাঁখার কোন দাম নাই,
ওই দু'টি হাতে পরাইয়া দিব ব'লে';
বাদিয়ার ঝালি মাথায় লইয়া
দেশে দেশে ফিরি কাঁদিয়া নয়ন-জলে।

সিঁদুর আমার ধন্য হইবে,
ওই ভালে যদি পরাইয়া দিতে পারি।
বিগানা দেশের বাদিয়ার লাগি
এতটুকু দয়া কর তুমি ভিন-নারী।
ননদী লো তুই উঠান হইতে
চ'লে যেতে বল বিদেশী এ বাদিয়ারে ;
আর বলে দেলো, ওসব দিয়ে সে
সাজায় যেন গো আপনার অবলারে।"
"কাজল বরণ কন্যা লো তুমি
ভিন্-দেশী আমি মোর কথা নাহি ধর,
যাহা মনে লয় দিও দাম পরে
আগে তুমি মোর শাঁখা-সিন্দূর পর।"

"বিদেশী বাদিয়া নায়ে নায়ে থাক,
পসরা লইয়া ফের তুমি দেশে দেশে ;
এ কেমন শাঁখা পরাইছ মোরে,
কাঁদিয়া কাঁদিয়া নয়নের জলে ভেসে ?
সিঁথার সিঁন্দূর পরাইতে তুমি,
সিঁদুরের গুঁড়ো ভিজালে চোখের জলে ;
ননদী লো তুই একটু ওধারে
ঘুরে আয়, আমি শুনে আসি, ও কি বলে।"
"কাজল বরন কন্যা লো তুমি
আর কোন কথা শুধোয়ো না আজ মোরে,
সোঁতের সেহলা হইয়া যে আমি
দেশে দেশে ফিরি, কি হবে খবর ক'রে।

নাহি মাতা আর নাহি পিতা মোর
আপন বলিতে নাহি বান্ধব জন ;
চলি দেশে দেশে পসরা বাহিয়া
সাথে চলে বুক-ভরা ক্রন্দন।
সুখে থাক তুমি, সুখে থাক মেয়ে—
সিঁথায় তোমার হাসে সিঁদুরের হাসি,
পরান তোমার ভরুক লইয়া
স্বামীর সোহাগ আর ভালবাসাবাসি।”

“কে তুমি, কে তুমি ? সোজন ! সোজন,
যাও—যাও—তুমি। এক্ষুনি চ’লে যাও !—
আর কোনদিন ভ্রমেও কখনো
উড়ানখালিতে বাড়ায়ো না তব পাও।
ভুলে গেছি আমি, সব ভুলে গেছি
সোজন বলিয়া কে ছিল কোথায় কবে,
ভ্রমেও কখনো মনের কিনারে
আনি নাক তারে আজিকার এই ভবে।
এই খুলে দিনু শঙ্খ তোমার
কৌটায় ভরা সিন্দুর নিয়ে যাও,
কালকে সকালে নাহি দেখি যেন
কুমারনদীতে তোমার বেদের নাও।”
“দুলী—দুলী—তুমি এও পার আজ।—
বুক খুলে দেখ, শুধু ক্ষত আর ক্ষত,
এতটুকু ঠাঁই পাবে নাক’ সেথা,
একটি নখের আঁচড় দেবার মত।”

"সে-সব জানিয়া মোর কিবা হবে ?
এমন আলাপ পর-পুরুষের সনে,
যেবা নারী করে, শত বৎসর
জ্বলিয়া পুড়িয়া মরে নরকের কোণে।
যাও—তুমি যাও এখনি চলিয়া
তব সনে মোর আছিল যে পরিচয়,
এ খবর যেন জগতের আর
কখনো কোথাও কেহ নাহি জানি লয় !"
"কেহ জানিবে না, মোর এ হিয়ার তলে,
চির কুহেলিয়া গহন বনের তলে,
সে-সব যে আমি লুকায়ে রেখেছি
জিয়ায়ে দুখের শাঙনের মেঘ-জলে।
তুমি শুধু ওই শাঁখা-সিন্দূর
হাসিমুখে আজ অঙ্গে পরিয়া যাও ;
জনমের শেষ চ'লে যাই আমি
গাঙে ভাসাইয়া আমার বেদের নাও।"

"এই আশা লয়ে আসিয়াছ তুমি
ভাবিয়াছ আমি কুলটা নারীর পারা ;
তোমার হাতের শাঁখা সিন্দূরে
মজাইব মোর স্বামীর বংশধারা ?"

"তুলী-তুলী মোরে আরো ব্যথা দাও
কঠিন আঘাত—দাও—দাও-আরো, আরো
ভেঙে যাক বুক,—ভেঙে যাক মন
আকাশ হইতে বাজেরে আনিয়া ছাড়।
তোমারি লাগিয়া স্বজন ছাড়িয়া
ভাই-বান্ধব ছাড়ি মাতা-পিতা মোর,
বনের পশুর সঙ্গে ফিরেছি
লুকায়ে র'য়েছি খুঁড়িয়া মড়ার গোর।
তোমারি লাগিয়া দশের সামনে
আপনার ঘাড়ে লয়ে সব অপরাধ,
সাতটি বছর কঠিন জেলের
ঘানি টানিলাম না করিয়া প্রতিবাদ।"

"যাও—তুমি যাও, ও-সব বলিয়া
কেন মিছামিছি চাহ মোরে ভুলাইতে,
আসমান-সম পতির গরব,
আসিও না তাহে এতটুকু কালি দিতে।
সেদিনের কথা ভুলে গেছি আমি,
একটু দাঁড়াও, ভাল কথা হ'ল মনে ;
তুমি দিয়েছিলে বাঁক-খাড়ু পা'র
নথ দিয়েছিলে পরিতে নাকের সনে॥

এতদিনও তাহা রেখেছিনু আমি,
কপালের জোরে দেখা যদি হ'ল আজ,
ফিরাইয়া তবে নিয়ে যাও তুমি—
দিয়েছিলে মোরে অতীতের যত সাজ।

আর এক কথা,—তোমার গলার
গামছায় আমি দিয়েছিনু আঁকি ফুল,
সে গামছা মোরে ফিরাইয়া দিও,
লোকে দেখে যদি, করিবারে পারে ভুল।
গোড়য়ের ধারে যেখানে আমরা
বাঁধিয়াছিলাম দুইজনে ছোট ঘর ;
মোদের সে গত জীবনের ছবি,
আঁকিয়াছিলাম তাহার বেড়ার পর।
সেই সব ছবি আজো যদি থাকে,
আর তুমি যদি যাও কভু সেই দেশে ;
সব ছবি গুলি মুছিয়া ফেলিবে,
মিথ্যা রটাতে পারে কেহ দেখে এসে।
সবই যদি আজ ভুলিয়া গিয়াছি,—
কি হবে রাখিয়া অতীতের সব চিন,
স্মরণের পথে এসে মাঝে মাঝে—
জীবনেরে এরা করিবারে পারে হীন।"
"দুলী, দুলী, তুমি। এমনি নিঠুর !
ইহা ছাড়া আর কোন কথা ব'লে মোরে ;—
জীবনের এই শেষ সীমানায়
দিতে পারিতে না আজিকে বিদায় ক'রে ?

ভুলে যে গিয়েছ, ভালই ক'রেছ,—
আমার দুখের এতটুকু ভাগী হয়ে,
জনমের শেষ বিদায় করিতে
পারিতে না মোরে দুটি ভাল কথা ক'য়ে ?
আমি ত' কিছুই চাহিতে আসিনি।
আকাশ হইতে যার শিরে বাজ পড়ে,
তুমি ত' মানুষ, দেবের সাধ্য—
আছে কি তাহার এতটুকু কিছু করে ?
ললাটের লেখা বহিয়া যে আমি
সায়রে ভাসিনু আপন করম ল'য়ে ;
তারে এত ব্যথা দিয়ে আজি তুমি
কি সুখ পাইলে, যাও—যাও মোরে ক'য়ে।
কি ক'রেছি আমি, সেই অন্যায়
তোমার জীবনে কি এমন ঘোরতর !
মরা কাষ্ঠেতে আগুন ফুঁকিয়া—
কি সুখেতে বল হাসে তব অন্তর ?
দুলী ! দুলী ! দুলী !—বল তুমি মোরে,
কি লইয়া আজ ফিরে যাব শেষ দিনে :
এমনি নিঠুর স্বার্থ-পরের
রূপ দিয়ে হায় তোমারে লইয়া চিনে ?
এই জীবনেরো আসিবে সেদিন
—মাটীর ধরায় শেষ নিশ্বাস ছাড়ি',
চির বন্দী এ খাঁচার পাখিটি
পালাইয়া যাবে শূন্যে মেলিয়া পাড়ি।

সে সময় মোর কি ক'রে কাটিবে,
মনে হবে যবে সারাটি জনম হায়,—
কঠিন কঠোর মিথ্যার পাছে
ঘুরিয়া ঘুরিয়া খোয়ায়েছি আপনায়।—
হায়, হায়—আমি তোমারে খুঁজিয়া
বাদিয়ার বেশে কেন ভাসিলাম জলে ?
কেন তরি মোর ডুবিয়া গেল না—
ঝড়িয়া রাতের তরঙ্গ-হিল্লোলে ?
কেন বা তোমারে খুঁজিয়া পাইনু,
এ জীবনে যদি ব্যথার নাহিক শেষ,—
পথ কেন মোর ফুরাইয়া গেল
নাহি পৌঁছিতে মরণের কালো দেশ।

পীর, আওলিয়া কে আছ কোথায়
তারে দিব আমি সকল সালাম ভার,
যাহার আশিসে ভুলে যেতে পারি
সকল ঘটনা আজিকার দিনটার।
এ জীবনে কত করিয়াছি ভুল ;
—এমন হয় না ? সে ভুলের পথ ধরে—
আজিকার দিন তেমনি করিয়া
চ'লে যায় চির-ভুলভরা পথ 'পরে।
দুলী, দুলী—আমি সব ভুলে যাব,
কোন অপরাধ রাখিব না মনে প্রাণে ;
এই বর দাও, এ জীবনে যেন
তব সন্ধান নাহি মেলে কোন খানে।

ভাটীয়াল সোঁতে পাল তুলে দিয়ে
আবার ভাসিবে মোর বাদিয়ার তরী ;
যাবে দেশে দেশে ঘাট হ'তে ঘাটে,
ফিরিবে সে একা দুলীর তালাস করি।
বনের পাখিরে ডাকি সে শুধাবে
কোন্ দেশে আছে সোনার দুলীর ঘর ;
দূরের আকাশ সুদূরে মিলাবে
আয়নার মত সাদা সে জলের পর।
চির একাকীয়া সেই নদী-পথ,
সরু জল-রেখা থামে নাই কোন খানে ;
তাহারি উপরে ভাসিবে আমার
বিরহী বাদিয়া, বন্ধুর সন্ধানে।
হায়, হায়—আজ কেন দেখা হ'ল
কেন হ'ল পুনঃ তব সনে পরিচয় ;
একটি ক্ষণের ঘটনা চলিল
সারাটি জনম করিবারে বিসময়।"

"নিজের কথাই ভাবিলে সোজন,
মোর কথা আজ ?—না—না—কাজ নাই ব'লে,
সকলি যখন শেষ করিয়াছি—
কি হইবে আর পুরান সে কাদা ড'লে।
ওই বুঝি মোর স্বামী এলো ঘরে,
এক্ষুণি তুমি চ'লে যাও নিজ পথে,
তোমাতে আমাতে ছিল পরিচয়—
ইহা যেন কেহ নাহি জানে কোন মতে।

আর যদি পার, আশিস করিও,
আমার স্বামীর সোহাগ আদর দিয়ে—
এমনি করিয়া মুছে ফেলি যেন,
যেসব কাহিনী তোমারে আমারে নিয়ে।”

“যেয়ো না—যেয়ো না—শুধু একবার
আঁখি ফিরাইয়া দেখে যাও মোর পানে ;
আগুন জ্বেলেছ যে গহন বনে,
সে পুড়িয়াছে আজ কি ব্যথা লইয়া প্রাণে।”
ধরায় লুটায়ে কাঁদিল সোজন,
কেউ ফিরিল না মুছাতে তাহার দুখ ;
কোন্ সে সুধার সায়রে নাহিয়া,
জুড়াবে সে তার অনল পোড়া এ বুক ?
জ্বলে তার জ্বালা খর দুপুরের
রবি-রশ্মির তীব্র নিশাস ছাড়ি,
জ্বলে—জ্বলে জ্বালা কারবালা পথে
দোম্‌কা বাতাসে তপ্ত বালুকা নাড়ী।
জ্বলে—জ্বলে জ্বালা খর অশনীর
ঘোর গরজনে পিঙ্গল মেঘে মেঘে ;
জ্বলে—জ্বলে জ্বালা মহাজলধীর
জঠরে জঠরে ক্ষিপ্ত ঊর্ম্মী বেগে।
জ্বলে—জ্বলে জ্বালা গিরিকন্দরে
শ্মশানে শ্মশানে জ্বলে জ্বালা চিতা ভ’রে ;
তার চেয়ে জ্বালা—জ্বলে—জ্বলে—জ্বলে
হতাশ বুকের মথিত নিশাস পরে।

জ্বলে—জ্বলে জ্বালা শত শিখা মেলি,
পোড়ে জল বায়ু—পোড়ে প্রান্তর বন ;
আরো জ্বলে জ্বালা শত রবি সম,
দাহ করে শুধু, পোড়ায় না তবু মন।
পোড়ে ভালবাসা—পোড়ে পরিণয়
—পোড়ে জাতিকুল—পোড়ে দেহ আশা-ভাষা ;
পুড়িয়া পুড়িয়া বেঁচে থাকে মন,
সাক্ষী হইয়া চিতায় বাঁধিয়া বাসা।
জ্বলে—জ্বলে জ্বালা—হতাশ বুকের—
দীর্ঘনিশাস রহিয়া রহিয়া জ্বলে ;
জড়ায়ে জড়ায়ে বেঘুম রাতের
সীমারেখাহীন আন্ধার অঞ্চলে।
হায়—হায়—সে যে কি দিয়ে নিবাবে
কারে দেখাইবে, কাহারে কহিবে ডাকি ;
বুক ভরি তার কি অনল জ্বালা
শত শিখা মেলি জ্বলিতেছে থাকি থাকি।

অনেক কষ্টে মাথার পশরা
মাথায় লইয়া টলিতে টলিতে হায়—
চলিল সোজন সুমুখের পানে—
চরণ ফেলিয়া বাঁকা বন-পথ-ছায়।

২৩

পাহাড়ের উপর পর্ব্বতেরে পর্ব্বতে হিরার ধার
সেই ধারে কাটিয়া গেল সোবর্ণের হার।
ছিরি খোলার হাটেরে ভাই নানান রঙের খেলা,
পিছের দিকে চায়া দেখ তোর ডুইবা গেল বেলা।

মুর্শীদা গান

তবুও আবার রজনী আসিল, জামদানী সাড়ীখানি
পেটেরা খুলিয়া স-যতনে তুলী অঙ্গে লইল টানি।
হাতে পায়ে দিল আলতার দাগ, আরশিতে বার বার,
ঠোঁটেরে ঘষিল, মুখেরে মাজিল রূপ দেখি আপনার।
সিঁথীর উপরে পুরু করি আঁকি রচিত সিঁদুর লেখা,
তিমির কেশের তীরে দেখা দিল রঙিন রবির রেখা
মাঠের যত না ফুল লয়ে তুলী পরিল সারাটি গায়,
খোঁপায় জড়াল কলমীর লতা, গাঁদা ফুল হাতে পায়।
স্বামী কয় তারে, এমন সাজেতে যে আজ দেখিবে তোমা,
কৃষাণের রাণী বলিবে কিম্বা তার চেয়ে মনোরমা।"

"কক্ষনো নয়," বাহু বেষ্টনে বাঁধিয়া স্বামীরে তার
দুষ্টু হাসিয়া কহে তুলী, "পার এত মিছে বলিবার।"
"প্রত্যয় নাহি? আচ্ছা না হয় ছিদাম ভাইরে ডাকি
এক্ষুনি এর মীমাংসা করি, এস তবে বাজি রাখি।"
"না, না, কাজ নেই, সত্য বল ত মোরে ভাল লাগে তব?"
"গুড়ের চাইতে—জিলিপির চেয়ে, কেমন করিয়া কব?

—যেমন খেতেতে মই দিতে লাগে—যেমন কাটিতে ধান,
আটির উপরে আটি বেঁধে যাই খুশীতে ভরিয়া প্রাণ।
—ওপাড়ার ওই বলাই খুড়োর উঠানে রাতের বেলা,
বনগেঁয়োদের হারায়ে দিলাম করিয়া লাঠির খেলা।
তার চেয়ে আরো শতগুণ ভাল তোমারে যে লাগে মোর,
তুমি যেন হও কুমড়ার ফুল, আমি ত ভোমর চোর।"

"আচ্ছা, আমারে কেউ যদি আসি জোর করে নিয়ে যায় ?"
"ধেৎ, তা কি হয় ! তুমি মোর বউ জানে সব লোক গাঁয়।
আমি ত তোমারে কারো কাছ থেকে চুরি ক'রে আনি নাই,
দস্তুর মত বিবাহ ক'রেছি জানে সব গাঁর ভাই।
আর কেউ যদি নিতেই আসে বা, তুমি তা যাইবে কেন ?
আমি যে সোয়ামী, মোর সাথে তুমি ঠাট্টা করিছ যেন।"
"মনেই কর না যদি কেউ মোরে জোর করে নিয়ে যায়,
তুমি কিবা কর জানিতে আমার আজিকে যে মন চায়।"
"কি কহিলা তুমি ? গোরাচাঁদ রায়, বংশীরামের নাতি
—কঠিন হাতের থাপড়ে যাহার ভূমিতে লোটাত হাতি ;
তার পোলা আমি কালাচাঁদ রায় বেঁচে আছি যতখণ—
আমার তিরিরে ছিনায়ে লইবে কোথা রয় হেন জন ?
কল্লাডা তার টান দিয়ে আমি ছিঁড়িতে পারিনে হাতে,—
হাড্ডি তাহার ভাঙিতে পারিনে আছ্‌ড়াতে আছ্‌ড়াতে ?"

‘আচ্ছা—আচ্ছা জানা যাবে সব, বস’ দেখি এইবার,
তোমার চুলেতে সিঁথী করে দেই, একটু নোয়াও ঘাড়।”
“তোমারে একটা কথা বলিবার ইচ্ছা হ’তেছে আজ,
হঠাৎ এমন কি খেয়াল হ’ল করেছ এমন সাজ।”
“তোমারে তা বুঝি ভাল লাগছে না, খুলে ফেলি সব তবে!”
“আহা-হা রেগো না, মুখ্যু যে আমি, বুদ্ধি কোথায় হবে?
কি বলিতে ছাই কি বলিয়া ফেলি, সত্যি বলিতে কিবা,
তুমি যেন আজ সেজেছ আমার আন্ধার ঘরে দিবা।
গরীবের ঘরে পড়িয়াছ তুমি মনের মতন করে,
সাজাতে পরাতে পারিনে তোমারে নানান গহনা ভরে।
যাহা এনে দেই, অভিমানে তাই অঙ্গে পর না হায়,
আমার পরান সারাদিন রাত কাঁদে এই বেদনায়।
লক্ষ্মীরে আমি পাতার ঘরের চালায় বন্দী করি,
সারাটা জীবন লইতেছি যেন কত অপরাধে ভরি।
আজিকে আমার কপাল খুলেছে, কাঙালের পূজা ল’য়ে
আমার দুলালী আমার সামনে বসিয়াছে খুশী হয়ে।
তোমারে এমন সাজে দেখে মোর কহিব কি বলে মনে,
—মনে বলে তুমি প্রতিদিনই যেন সাজ হেন স-যতনে।
তোমারে এমন মানায়েছে আজ, চেয়ে তব মুখ ’পরে
ইচ্ছা হইছে নাচি যেন আমি, উঠি জোরে গান করে।”

“কথা না থাকিলে ওই মুখে তবে ভানিত সকলে ধান!”
“তোমারে পারায়ে চিঁড়া কুটে তবে করিতাম খান্ খান্।”
“বাজে কথা রাখ, আজকে ত গাঁয়ে বেদে এসেছিল কত,
কেন রাখ নাই চুড়ি ও বয়লা আপন মনের মত।

আহা ওই শোন, বেদে-নাও হ'তে কেমন বাজিছে বাঁশী,
আহারে কাহার বুক ভাঙিয়াছে লয়ে কি দুখের রাশি।"
"ছাই বাঁশী বাজে, তার চেয়ে এসো দু'জনে গল্প করি
হাসি তামাসায় কাটাইয়া দেই আজিকার বিভাবরি।"
"না না তুমি শোন, এমন মধুর বাঁশী কভু শুনি নাই,
মন বলে আমি পাখা হয়ে তার সুর সনে উড়ে যাই।"
"দেখ পায়ে পড়ি, আমার একটি কথা পার রাখিবার ?
কে বাঁশী বাজায় ? কহ যেয়ে উহা বাজায় না যেন আর।"
"কেন থামাইবে ? কান পেতে থাক, যেন কার কত ব্যথা
রাতের উড়াল আউলা বাতাসে কহিছে বুকের কথা।"

"ভাল নাহি লাগে, তুমি কি উহারে থামাইতে পার নাক ?
এত পারি আমি, শত পারি শুধু মুখেই বলিয়া থাক।"
"চুপ কর বড় ঘুম পাইতেছে, বাঁশী যেন আজ মোর
দুইটি নয়ন ভরিয়া আনিছে কোথাকার ঘুম ঘোর।"
"না না তুমি আজ ঘুমোতে পাবে না, বাহিরে গহন রাত্রি,
কালো কুজ্ঝটি আঁধারের পথে দোলাইছে তারা-বাতি।
রহিয়া রহিয়া উতল পবনে বাজিছে নিঠুর বাঁশী,
সুরের সূতায় দোলায়ে দোলায়ে কাহার গলের ফাঁসী।
ওগো তুমি কেন ঘুম গেলে আজ ? দারুণ সিধেল চোরে—
ঘরে যে তোমার প্রবেশ করিয়া সব নেয় চুরী করে।
জাগ—জাগ পতি, দেবতা আমার। সোহাগ আদর দিয়ে
জনমের মত বেঁধে রাখ আজ এই অভাগীর হিয়ে।"

না—না তুলী আজ কিছুতেই তার স্বামীর আসনখানি,
অশুচি করিতে পারিবে না কভু, আর কারো স্মৃতি আনি
দুই কানে দিল তূলা দিয়ে ছিপি, নিদারুণ বাঁশী হায়,
কেন সে গোপন পথ দিয়ে বুকে আসে যায় আর যায়।
আঁটিয়া দুয়ার বন্ধ করিল, শাড়ীর আঁচল ছিঁড়ে,
ঘরের বেড়ার যত ফাঁক ছিল এঁটে দিল ধীরে ধীরে
নিঠুর সে বাঁশী মানে না বারণ, স্বামীর সুনাম তার,
বিত্তি-বেসাত জোর করে তুলী মনে করে বার বার।
হায় সে বাঁশীর সুরের জোয়ারে সকল ভাসিয়া যায়,
অবলা বালিকা—ভগবান। তুমি শক্তি দাহ গো তায়।
সুরের উপরে সুর ভেসে আসে সহস্র দিক ভরি,
সহস্র সুরে আজ যেন বাঁশী ফিরিছে তাহারে স্মরি।
সেই সুরে যেন রসিতে বাঁধিয়া বিস্মৃতি দেশ হ'তে,
ঘটনার পর ঘটনা টানিছে কালিয়-দহের সোতে।
না—না—তুলী সব ভুলিয়া গিয়াছে, নারী সে যে অসহায়,
মন যে তাহার খেলার পুতুল সমাজের হাতে হায়।
তবু—তবু আজ সব মনে পড়ে—ভগবান—ভগবান!
তুমি ত জানিছ কত সহিয়াছে তাহার বালিকা প্রাণ!

বাজে বাঁশী বাজে, নিঠুর আমারে কি দোষ পাইয়া হায়,
ঘরের বাহির করিয়া আজিকে বাঁধিলে কঠিন ঘায়।
কোন্ দোষে তুমি ভুলিলে আমারে, ভুলিয়াই যদি গেলে,
কঠিন কথার আঘাত হানিয়া কি সুখ পরাণে পেলে।
আমি এই সুখ সহিতে পারি নে—বাজে বাঁশী বাজে হায়,
সুরে সুরে তার আকাশ বাতাস মূরছে কি বেদনায়।

জাগ জাগ পতি, জনমের শোধ বিদায় দাহ গো মোরে
এ অভাগিনীরে দেখিবে না আর আজের নিশীর ভোরে।
সাক্ষী থাকিও চন্দ্রসূর্য্য আর যত দেবগণ !
তোমরা সকলে শুনিতেছ এই অভাগীর ক্রন্দন।
সাক্ষী থাকিও সীঁথার সিঁদুর, আমারে ডাকিছে বাঁশী
কাঞ্চা বয়সে পরাইয়া মোর গলায় কঠিন ফাঁসী।
আমি চলিলাম, অভাগা পতিরে।—তাহার নাহিক দায় ;
কপালের লেখা লইয়া চলিনু কপাল ভরিয়া হায়।
কালকে সকালে আমার লাগিয়া কাঁদিয়া পাগল হবে,
এই কথা পতি!—মরণ পরেও মোর স্মৃতিপথে রবে।
ছয়মাস আমি তোমার সঙ্গে কোন কথা কহি নাই,
আরো ছয়মাস কাটিয়েছি আমি লয়ে মোর বেদনাই।
মোরে সুখ দিতে কত না কষ্ট করিয়াছ কত মতে,
আমি নারিলাম তোমার জীবনে এতটুকু সুখ হ'তে।
ক্ষমা কর মোরে, ক্ষমা কর পতি, বুকেতে ভরিয়া বিষ,
যারে ছুঁইয়াছি এ জগতে তার পোড়ায়েছি দশদিশ।
সাক্ষী থাকিও রাতের আঁধার,—তারার বসন ধ'রে,
সাক্ষী থাকিও বসুমতী মাতা, নাগের মাথার পরে ;
এই হতভাগী চলিল আজিকে লয়ে তার ভাঙা বুক,
নিয়ে যাও সবে—নিয়ে যাও তার জীবনের সব সুখ।
বাজে বাঁশী বাজে, রাতের আঁধারে, সুদূর নদীর চরে,
উদাসী বাতাস ডানা ভেঙে পড়ে বালুর কাফন পরে।

ধীরে অতি ধীরে স্বামীর চরণে ঘসিয়া কপাল খানি,
জীবনে শেষ বিদায়ের কথা লিখে গেল রেখা টানি।

তারপর ধীরে দুয়ার খুলিল, ধীরে—অতি ধীরে ধীরে,
মাঠপানে দুলী বাহির হইল দুহাতে আঁধার চিরে।
বাজে বাঁশী বাজে—"দুলী। দুলী! তুমি আমারে করিও ক্ষমা,
কোন অপরাধ থাকে যদি মোর তোমার নিকটে জমা।
যদি কোন ব্যথা দিয়ে থাকি আমি তোমার সুখের ঘরে,
যদি দিয়ে থাকি কোন জঞ্জাল তোমারে স্মরণ করে ;
এই বলে মোরে ক্ষমা কর তুমি, সহস্র ব্যথা ভার
সহস্র দিক হইতে যে আমি সহিয়াছি বার বার।"
"সোজন। সোজন। কেন মোর লাগি এত ব্যথা তুমি পাও ?
মোর অনুরোধে, তোমার জীবনে অভাগীরে ভুলে যাও।"
"কে তুমি ? কে তুমি ? দুলী—দুলী ? দুলী—এলে কি
দেখিতে তারে ;
আগুন জ্বেলেছ যে বনে, সে পোড়ে কি দারুণ ব্যথা-ভারে।
আমারে লইয়া আর ভয় নাই স্মরিয়া অতীত দিন
তোমার পতির গরবেরে কেউ যাবে না করিতে হীন।
আসিয়াছ যদি জনমের শোধ দাঁড়াও সামনে মোর
ওই তব রূপ দেখিতে দেখিতে আঁখি হয়ে যাক ঘোর।"

"সোজন। সোজন! এ কি বল তুমি ?—অভাগীরে মনে করি
তোমার সোণার জীবনেরে কেনবা ব্যথায় ভরি ;
ঘরে ফিরে যাও, দেখিয়া শুনিয়া করগে নতুন বিয়া,
আবার সাজাও নতুন কুটীর তাহারে বক্ষে নিয়া।"

"দুলী—দুলী! আমি পায়ে পড়ি তব, বাঁচিব বা কতখণ,
মোরে দয়া কর, ব্যথা দিয়ে আর বিদ্ধ ক'র না মন।"

"সোজন—সোজন !—শুন মোর কথা আজিকে বুঝেছি সার,
দুইজন মোরা বাঁচিয়া থাকিলে নিস্তার নাহি কার।
আমি যদি মরি, আমারে ভুলিতে সহজ হইবে তব,
আর সে মরণে এ জীবনে আমি সব চেয়ে সুখী হব।
তোমরা পুরুষ কি ক'রে বুঝিবে একেরে পরাণ দিয়া,
নারীর জীবন কি করিয়া কাটে আরেরে বক্ষে নিয়া।
নিজের সঙ্গে অনেক যুঝিয়া পারিলাম নাক আর,
বুঝিলাম আর সাধ্য নাহিক এ জীবন বহিবার।
যাইবার কালে এইকথা শুধু ব'লে যাই তব কাছে,
যে দুলীরে তুমি জানিয়াছ আজ, তাহা ছাড়া আরো আছে,
এক দুলী যার জীবনের প্রতি নিশ্বাসটুকু হায়,
চির বিরহিয়া সোজনেরে তার স্মরিতেছে নিরালায়।"

"কি কথা শুনালে ওহে দুলী তুমি বল দেখি আর বার,
জীবন যেনরে জুড়াইয়া গেল সাধ হয় বাঁচিবার।"
"আজো দুলী তার সোজনেরে ছাড়া কাহারেও নাহি জানে,
সোজন তাহার ঘরে ও বাহিরে দেহে মনে আর প্রাণে।"

"হায় হায় দুলী। এই কথা কেন আগে বল নাই মোরে,
তাহ'লে হয়ত বাঁচিতাম ভবে আরো কিছুদিন তরে।
আমি যে খেয়েছি আপনার হাতে বিষ-লক্ষের বড়ি,
শিয়রে আমার ভিড়িয়াছে আসি—মরণ-পারের তরি।"
"কি কথা শুনালে পরাণের সখা ! কি কথা শুনালে হায়,
কি দোষ পাইয়া বিষের শায়ক হানিলে পরানটায়।

তুমি যদি আজ চলিলে বন্ধু, আমারে সঙ্গে নাও,
জনমের মত ছেড়ে চ'লে যাই এই ধরণীর গাঁও।
সাক্ষী থাকিও চন্দ্র সূর্য্য, আর যত দেবগণ।
জনমের মত চ'লে যাই মোরা লয়ে ব্যথা ক্রন্দন।"

* * *

পরদিন ভোরে গাঁয়ের লোকেরা দেখিল বালুর চরে
একটি যুবক একটি যুবতী আছে গলাগলি ধরে।
অঙ্গে অঙ্গে মিলিয়া অঙ্গ, প্রাণপাখি গেছে উড়ি,
মাটির ধরায় সোনার খাঁচাটি পায়ের আঘাতে ছুঁড়ি।

ঘাটে লাগাওরে নাও,
কূলে লাগাওরে নাও ;
আমি চিন্তা লই বেপারী রে,
নাও ঘাটে লাগাও।
বাইলাম নৌকা ঘাটেরে ঘাটে নাহি পাইলামরে কূল,
এই গাঙে ভাসায়ারে দিছি আমার সোবর্ণের ফুল ;
—রে নাও ঘাটে লাগাও।

—মুর্শীদা গান

দিবসের সহ-মরণ-চিতায় আপনারে দিতে তুলে
সন্ধ্যা সাজিছে নানা আভরণে নাহিয়া নদীর কূলে।
গায়ে জুড়ায়েছে রাঙা মেঘ-চেলী, ভাসে সিঁদুরের লেখা,
রঙিন পায়ের পরশে কাঁদিছে ভুবন ভরিয়া রেখা।
মাথায় বহিয়া চাঁদের প্রদীপ চ'লেছে মৃদুল পায়,
সপ্তঋষিরা মন্ত্র পড়িছে দূর গগনের গায়।
পিছনে চ'লেছে তারকা সাথীরা কাঁদিয়া ঝিল্লীস্বনে,
একে একে তারা ঝাঁপায়ে পড়িবে সখীর চিতার কোণে।
গেঁয়ো নদী তার ছোট ছোট ঢেউ নাড়িয়া কূলের গায়,
ঘাট হ'তে ঘাটে অতি মৃদু স্বরে কহিছে এ বেদনায়।

এই গাঙ দিয়ে কার নাও চলে ? উদাসী ভাটীর সুরে
যায় যে ভাসিয়া আপনার ব্যথা বাউল বাতাস পূরে।
বাঁকা নদী বেয়ে চলে তার তরী, ডাকিয়া শুধায় সবে,
"সোজন বেদের ঘাটখানি বল আর কত দূরে হবে ?"
"কোন্ সে সোজন, কোথায় বসতি ?" "শোন শোন সেই ব্যথা,
শোন শোন সেই অভাগা বেদের দুস্কের যত কথা।"
এই ব'লে ঘাটে লাগায়ে তরণী আরম্ভ করে গান,
সারিন্দাখানি সাথে সাথে কাঁদে ছাড়িয়া ভাটীর তান।

"শোন শোন সেই অপূর্ব্ব কথা সিমুলতলীর গাঁয়
সোজন দুলীর খেলা-ঘরখানি বনের তরুর ছায়।
স্বজন ছাড়িয়া বান্ধব ছাড়ি দুইটি তরুণ হিয়া
গভীর নিশীথে বাহির হইল এ উহারে আগুলিয়া।
তারপর সেই ছোট ঘরখানি গোড়ই নদীর তীরে,
মনের কথারে দোলা দিত তারা তাহার ছায়ায় ঘিরে।
সেই ঘর হায় ভাঙিয়া পড়িল ঝরিয়া রাতের বায়,
দুলালীর সেই বিবাহ হইল ভীনদেশী এক গাঁয়।
তারপর সেই বেদের কাহিনী শোন যত বোন ভাই,
জীবনের দীপ নিবেছে তাদের ভালবাসা নেবে নাই।
এক নদী তীরে গেঁয়ো ঘাটখানি তাহারি শীতল ছায়,
আজিও তাহারা গলাগলি ধরি কাঁদিতেছে নিরালায়।"

গান শেষ হয়, পল্লীবাসীরা আঁচলে মুছিয়া বারি
বলে, "এ কাহিনী কোথায় শুনেছ ? কোথা পেলে খোঁজ তারি ?"
"লোকের মুখেতে শুনেছি ঘটনা, আর কিছু নাহি জানি,
নদীতে নদীতে ফিরিতেছি একা সেই ঘাট সন্ধানি'।
শুনেছি সে ঘাটে গভীর নিশীথে বিছায়ে তাপিত বুক
যত বিরহীরা আপন মনের জুড়ায় সকল দুখ।
শুনেছি সে ঘাটে কলসী ভরিয়া বধূরা ফিরিত ঘরে,
এক ফোঁটা আঁখিজল রেখে যায় সে অভাগাদের তরে।"
"ওগো মাঝি ভাই! কোনদিন যদি সন্ধান পাও তারি,
ফিরিবার পথে সেই ঘাট হ'তে আনিও তীর্থ বারি।"
সরু সে জলের রেখাপথ ধরি মাঝি দূর পথে ধায়,
সন্ধ্যাতারার দীপ নিবে যায় পশ্চিম নীলিমায়।

—শেষ—

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের পক্ষে
মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।